সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

আগস্ট ২০১৪

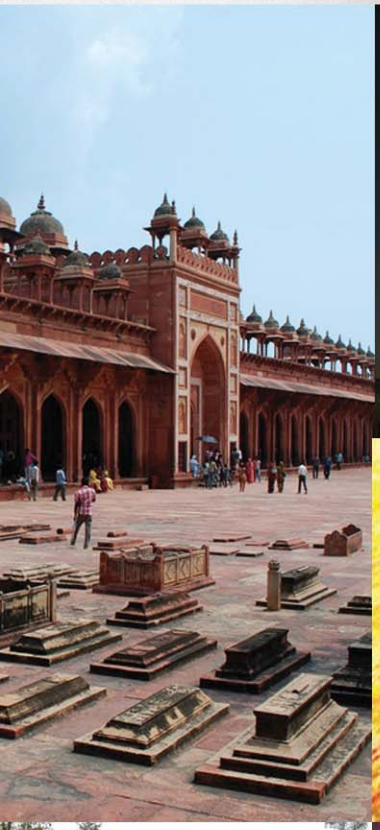

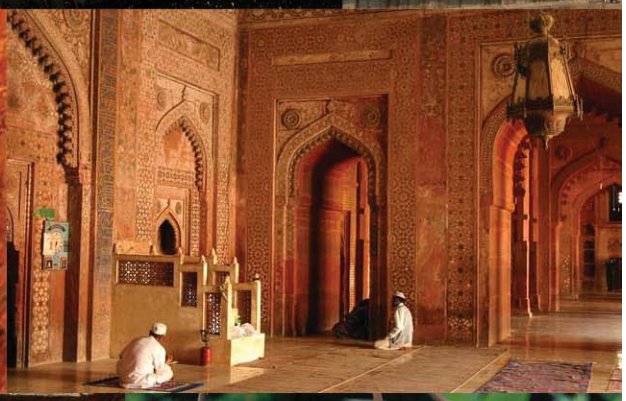

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে...

Tryst with the destiny...

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.

At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance.

Jawaharlal Nehru

the first Prime Minister of independent India

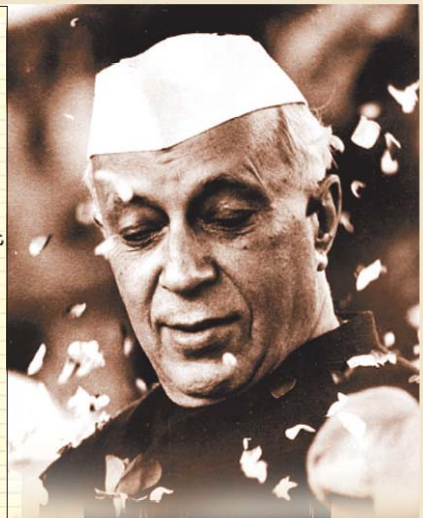

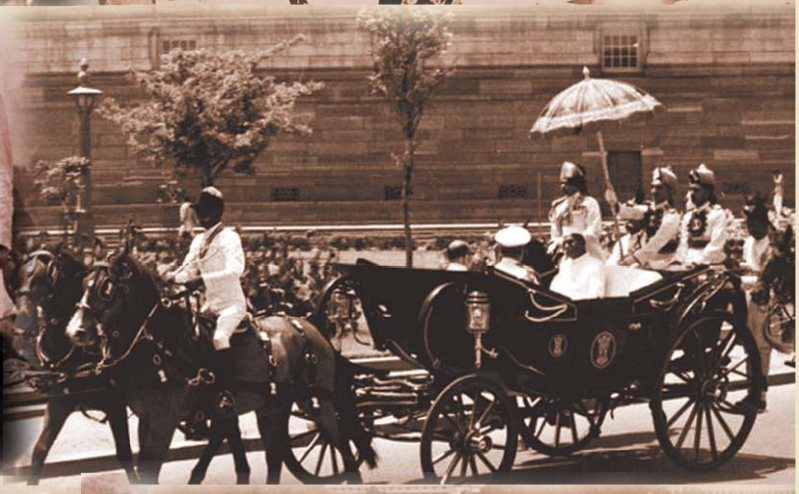

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ বিয়ালিশ | সংখ্যা ০৮ | শ্রাবণভাদ্র ১৪২১ | আগস্ট ২০১৪

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka

লাইক ও ভিজিট করুন ভারত বিচিত্রা page: Bharat Bichitra; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Iccr Dhaka Follow us on twitter HCI Dhaka @hcidhaka

নজরুলের শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবী

ভারতের স্বাধীনতা দিবস

সূচিপত্র

নজরুলের শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবী ০৪
লোকগীতির সুরবৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথ ০৯
নজরুল সংগীতে লোকজ সুর ১৭
ছোটগল্প: কোন এক ঝড়ের রাতে ২০
কবিতা ২৪
ভারতের স্বাধীনতা দিবস ২৬
ছোটগল্প: কণ্ঠজীবী ২৮
ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্য দ্রষ্টব্যসমূহ ৩৩
চিরকালের নজরুল ৪১
ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৪৩
শেষ পাতা: সন্তোষ গুপ্ত ৪৮

ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্য দ্রষ্টব্যসমূহ

ভারত প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ তাবৎ পৃথিবীর কাছে ছিল অতীব বিস্ময় ও আগ্রহের কেন্দ্রভূমি। পৃথিবীর বহু জাতি তাই ভাগ্য পরিবর্তনে, দিগ্বিজয়ে, ব্যবসায়, ধর্ম প্রচার, শিক্ষা ব্যাপদেশে এখানে এসেছে এবং ভারত ভূমিতে ক্রমে লীন হয়ে গেছে। সেকারণে বহু ঐতিহাসিক স্থাপনা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছিটি য়ে আছে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য দ্রষ্টব্যসমূহের ১৩টি স্থানের সচিত্র বিবরণ ৩৩ পৃষ্ঠায় নতুন করে উপস্থাপিত হল।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

উপভোগ্যতায় সেরা...

মে সংখ্যা ২০১৪র *ভারত বিচিত্রা* পড়ে আমি যেন জেগে উঠলাম। দেখলাম, চমৎকারভাবে সম্পাদকীয় কর্তব্যবোধ এখানে কাজ করেছে। হাতে প্রাপ্ত শুধু কয়েকটি লেখা ছেপে দিলেই কাজ শেষ হয় না। যে পাঠকেরা তা পড়বেন, তাদের অন্তরে সুপ্ত চাহিদার উপযুক্ত প্রাপ্তি যেন ঘটে তার দিকেও অবশ্য নজর রাখা দরকার। সেদিক দিয়ে পূর্ণতায় ভরপুর হয়েছে মন... তাই সুপ্তিবোধের অকারণ জড়তা থেকে অবশেষে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

মে মাস, বিশ্বকবি ও বিদ্রোহী কবির জন্ম মাস... এই চিন্তা মাথায় রেখে পত্রিকা খুলেই লক্ষ্য করা গেল, এখানে *বিদ্রোহী* কবিতাটি আদ্যোপান্ত পুনর্মুদ্রিত। পত্রিকা প্রাপ্তির আগের রাতে কেন যে অন্তরে জাগছিল *বিদ্রোহী* কবিতাটি পড়বার আকাঙ্ক্ষা, জানি না, পরদিন দুপুরে পত্রিকা পাওয়ায় সে চাহিদা যে এভাবে মিটবে কল্পনাও করতে পারিনি। শুধু কি তাই? নজরুলের *পদ্মগোখরো* ছোটগল্প ও শিশুতোষ সেই অনবদ্য কবিতাগুলোও একসঙ্গে একত্রে পেয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম কিন্তু বোধ হল আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' নামের প্রবন্ধটি। লেখক *কল্লোল*যুগের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ভাবলাম, *বিদ্রোহী* কবিতাটিতো পড়বই, তবে তার আগে গলাধঃকরণ করে নিই এই মহতী মহান রচনাটি। হ্যাঁ, তাইই করলাম। প্রবন্ধ নামে পরিচিত ইট-কাঠসদৃশ অন্যান্য রচনার সঙ্গে এর পার্থক্য এত বিপুল যে তা অনুভব করে এ বয়সে আরেক প্রস্থ অবাকই হতে হল আমাকে। সত্যিকার লেখকের এইই তো গুণ।

আর কাজী নজরুল ইসলামের গজল? করুণাময় গোস্বামীর মহতী রচনার স্পর্শের সঙ্গে প্রবন্ধটির ওপরে সম্পাদক পছন্দকৃত মুদ্রিত নজরুল ইসলাম, প্রতিভা বসু ও সরযূবালা দেবীর ছবিখানা? না, আমি আর প্রশংসা করতে অক্ষম– শুধু বলব, অভূতপূর্ব অপূর্ব দৃশ্য দেখার মনোরম প্রাপ্তিতে আমার অন্তর মন পূর্ণ হয়ে গেল। এই প্রতিভা বসু? আমাদের ঢাকার মেয়ে– আর তাঁর মা? বাহ! একদা *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিভা বসুর *দু'কূল হারা* নামের বিখ্যাত ছোটগল্পটির অন্তরকথন তখন আমার হৃদয়ে ঝড় তুলতে লাগল।

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। এর মধ্যে লেখকের জন্ম, শিক্ষা, পল্টনে যোগদান ইত্যাকার প্রসঙ্গের উলেখ থাকলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু বাদ পড়েছে। নজরুলের এমন চমৎকার বিবাহ প্রসঙ্গটি আসেনি। কেন?

শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি রচনা রয়েছে। অপূর্ব কর ভারতীয় লেখক। তাঁর লেখাটির ব্যাপ্তি কম হলেও এর মধ্যে অনেক তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে... পড়ে অনেক কিছু জানা গেল। বর্ষমাস ধ রে বাংলামাসের প্রারম্ভিক কালের ঘটনাটি তিনি বিবৃত করেছেন। এত সূক্ষ্মভাবে ব্যাপারটি সত্যি জানা ছিল না। ধন্যবাদ তাঁকে।

শ্যামল দত্তচৌধুরীর *খেলা ভাঙার খেলা* গল্পটিকে কোনক্রমেই অবহেলা করা যায় না। বলতে কি বর্তমান কলেজ/ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া যুবকযুবতী দের যাবতীয় কার্যক্রম ছোটগল্পের সীমিত অবয়বে তিনি যথার্থ ধরেছেন। পড়ে শিহরণ জাগে– এই আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাজ কর্ম শিক্ষা ইত্যাদি করার ও গ্রহণের ফিরিস্তি!

একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় এ আবার কার ওপরে লেখা? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের? আমার প্রিয় লেখক। হ্যাঁ, এই মে মাসেইতো তাঁর জন্ম। ১৯ মে ১৯০৮। খুব নিবিষ্ট পঠনে অনেক কিছু অধিগম্য হল, তাঁর বিষয়ে। কিন্তু প্রতিবেদকের দু'টি বাক্য সহনীয় হল না: 'ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় তত্ত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত এই লেখকের আভ্যন্তরিক রিয়ালিজম-ঘেঁষা মনোভাব তাঁকে শিল্পজীবনের আদর্শ থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে বিচ্যুত করেছিল। এমন কি, মধ্য ও শেষ দিকের লেখায় তিনি সচেতনভাবেই অসুন্দরের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না।' এ মানতে রাজী নই! ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ অথবা মার্কসীয় চিন্তা সংবলিত বক্তব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের বইয়ের কতিপয় গল্পে চমৎকার উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে সাহিত্যিকের তথাকথিত জীবনাদর্শ থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে হয়েছে, এমনটিতো নজরে আসে না।

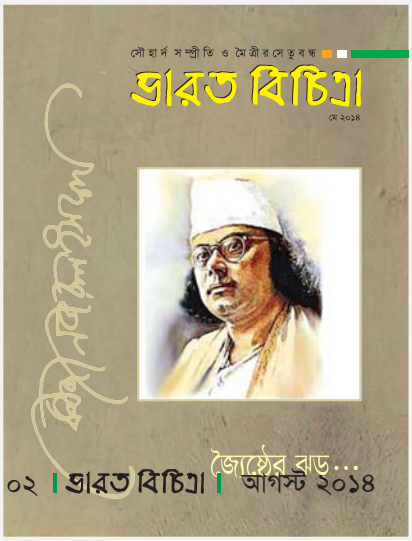

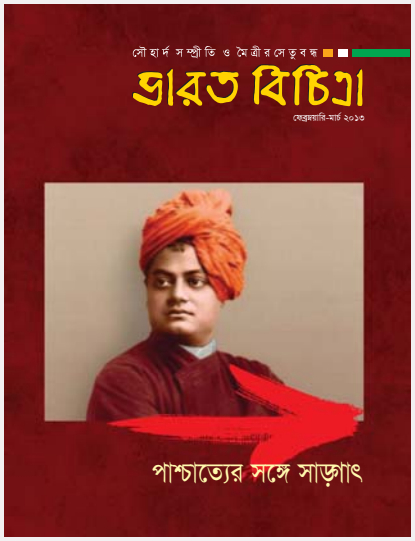

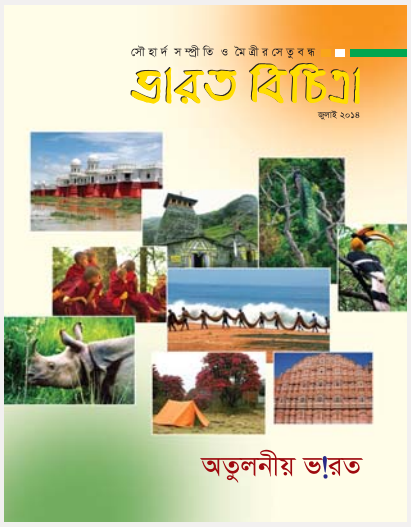

সবশেষে সম্পাদক মহাশয়কে এজন্যে সাধুবাদ জানাই যে, তিনি সম্পাদকীয়তে সবার সঙ্গে ভারতে আধুনিক চিন্তার ধারক মহান রাজা রামমোহন রায়ের নামোলেখ করতে ভোলেননি এবং পত্রিকায় তাঁর একটি ছবিও ছেপেছেন।

ইজাজ হোসেন শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক
দামোদর, ফুলতলা, খুলনা

আগ্রহের খোরাক

*ভারত বিচিত্রা*র ফেব্রুয়ারিমার্চ ২০১৩ সংখ্যাটি হাতে পেয়ে প্রচ্ছদে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখে বুঝলাম, এতে আমার অনেক আগ্রহের খোরাক পাওয়া যাবে। ভারতের প্রথম বিশ্ব নাগরিক মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার আগ্রহ সেই ছোটবেলা থেকেই। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে *ভারত বিচিত্রা* আমার সেই আগ্রহের অনেকটাই মিটিয়েছে। অধ্যাপক মকরন্দ আর পরঞ্জাপের প্রচ্ছদ রচনা *পাশ্চাত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ* ও ড. উষারানী সরকারের *রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নিবেদিতা* লেখা দু'টি সত্যি অসাধারণ। এ ধরনের তথ্যনির্ভর সচিত্র লেখা উপহার দেওয়ার জন্য *ভারত বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। লেখকত্রয়ের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা। এই সংখ্যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দীপক গোস্বামীর *সাহিত্য তীর্থ বঙ্কিমভবন* লেখাতে আমি অনেক অজানা তথ্য ও বেশ কিছু দুর্লভ ছবি পেয়েছি। এসব আমার সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে। খ্যাতিমান বঙ্গসন্তানদের সম্পর্কে *ভারত বিচিত্রা* আমাদের আরো তথ্যসমৃদ্ধ লেখা উপহার দেবে এই প্রত্যাশা রাখছি।

প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সংশোধনী

ভারত বিচিত্রা জুলাই ২০১৪ সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠার মানচিত্রে ভুলবশত 'ব্রহ্মপুত্র নদ'এর স্থানে 'ব্রহ্মপুত্র হ্রদ' ছাপা হয়েছে। এই অনভিপ্রেত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্পাদকীয়

কী আশ্চর্য মরমী কবি তিনি, স্বপ্নদ্রষ্টা– একটি গান লিখেছিলেন বর্ষার, শ্রাবণকে কেন্দ্র করে, এত মায়াবী যে, যতবারই শোনা যায়, চোখ ভরে আসে জলে। 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এসেছিস বল– হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল'। তার পরের লাইন দু'টি যদি দেখেন, 'বাদলহাওয়ায় দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে– ফুল-ফোটানোর খেলায় কোন ফুলঝরা নোর ছল'। পুরো গানটির পরতে পরতে যেন ঝরা বকুলের দীর্ঘশ্বাস।

যেদিন কবি চলে গিয়েছিলেন, সেদিন সকালের চিত্র এখনো যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাই। ভরা বর্ষায় গঙ্গার দু'কুল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে যেন। জলদগম্ভীর মেঘস্বরে চারদিক থমথমে। এর মধ্যে কলকাতাসহ বাংলা যেন উৎকণ্ঠিত, সচকিত, বাকরুদ্ধ। আশি বছর আগে যে তিমিরবিদারী জ্যোতির্ময় পুরুষ এসেছিলেন বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে, তাঁর বিদায়ক্ষণ যে সমাগত প্রায়! শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আনা হয়েছে কবিকে– কবির শরীরে 'অস্ত্র' করতে হবে, কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে তরুণ ডাক্তাররা বলছেন, জটিলতা সামান্যই, 'অস্ত্র' করলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। অপরদিকে নীলরতন ধরের মত ডাক্তার বলছেন, মনে রাখবেন, মানুষটি রবীন্দ্রনাথ। যত সহজ ভাবছেন, ততটা নাও হ তে পারে। কবি নিজেও অস্ত্রোপচারের বিপক্ষে, ঈশ্বর যে দেহটা দিয়েছেন, কোনরকম কাটাছেঁড়া না করে তাঁকে ফেরত দিতে চান। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনলেন না। শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার তাই হল, সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে কবি যাত্রা করলেন অনন্তলোকে– আকাশ ছাপিয়ে তখন বৃষ্টি নেমেছে! 'ওগো, কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে, ফেরে সে কোন স্বপন-লোকে। মন বসে রয় পথের ধারে জানে না সে পাবে কারে– আসাযাওয়ার আভাস ভা সে বাতাসে চঞ্চল'। সবই তো তিনি বলে গেলেন! চাঁদের চোখে আবেশ দেখে তিনি স্বপনলোকে চলে গেলেন, আমরা আসা-যাওয়ার পথের ধারে তাঁর স্মৃতি নিয়ে শূন্যহাতে বসে রইলাম! আমরা আর কীই বা আন তে পরি তাঁর জন্যে– কান্না ছাড়া? আমরা তাই এনেছি।

পারি লিখেছিলেন 'আজি হতে শতবর্ষ পরে, এখন করিছে গান, সে কোন্ নূতন কবি তোমাদের ঘরে! আজিকার বসন্তের আনন্দঅভিবাদন পাঠা য়ে দিলাম তার করে।' নতুন কবিকে আপনি সহর্ষঅভিবাদন জানি য়েছেন কবি, কিন্তু আজও যে আপনাকে ভুলতে পারি না আমরা। আপনি এমনই অপরিহার্য আমাদের জীবনে!

আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের আরেক মহৎ কবিকে আমরা হারিয়েছি– জ্যৈষ্ঠের ঝড় হয়ে এসে যিনি শ্রাবণ পেরিয়ে অকালবোধনের আগে সুদূরলোকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের মর্মান্তিক জীবনালেখ্য আমরা কম-বেশি জানি, কিন্তু তাঁর শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবীর কথা জানেন হাতেগোনা জনাকয়েক মাত্র। প্রমীলাজননী গিরিবালা দেবীর ওপর রচিত প্রবন্ধটি নজরুলপ্রেমীদের পরিতৃপ্ত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই অভাগিনী সর্বস্বত্যাগী মহীয়সী নারীর প্রতি আমাদের বিনম্র প্রণতি।

প্রবন্ধ

নজরুলের শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবী

অতুল পাল

দুটি ভিন্নধর্মাবলম্বী তরুণ-তরুণীর প্রেমের কাহিনি সেদিন ব্যর্থ হয়ে যেত যদি গিরিবালা সেনগুপ্তা নামে এক গ্রাম্যবিধবা না থাকতেন। এই গিরিবালা দেবী সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। অথচ সেই কবে– জাতি-ধর্ম বিভেদের যুগে, জাতি-বর্ণবিদ্বেষ ভারাক্রান্ত বাংলার বুকে এক দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করে নিজের একমাত্র কন্যাসন্তানের বিয়ে দিয়েছিলেন এক ভ্রাম্যমাণ মুসলিম পাত্রের সঙ্গে, তাঁর দৃষ্টিতে যিনি ভবিষ্যতে হবেন বাংলা তথা সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জাগ্রত বিবেকস্বরূপ। তিনিই নজরুল যাঁর কণ্ঠ ও কলমে ভবিষ্যতে অবিরত অগ্নিবর্ষণ হবে ইতিহাসের বুকে– সেই ভয়ানক পাত্রকে কন্যাদান করে যিনি শান্তসুন্দর গৃহকোণ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে, সমাজ-সংসার ত্যাগ করে পরবাসী হতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং দুর্ভোগের চরম অবস্থায় পড়েছিলেন। এমনকি মুসলিম জামাইয়ের টাকা আত্মসাৎ করার মত জঘন্য অভিযোগের দুর্নাম মাথায় নিয়ে তিনি চিরদিনের মত কলকাতার রাস্তায় হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সেই কুৎসানিন্দিত জীবনের পরিনির্বাণ ঘটেছিল এক অজানা রহস্যের মধ্যে। নানা উপায়ে অনুসন্ধান করেও তাঁর অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা হয়নি কোনদিন।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে গিরিবালাদেবী ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার (অধুনা জেলা) শিবালয় উপজেলার তেওতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবামা য়ের নাম জানা যায়নি, তবে তাঁর পিতার কুলগত পদবি ছিল দাশগুপ্ত। পিত্রালয়ের নিকটে উক্ত গ্রামেরই বসন্তকুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে বিবাহসূত্রে তিনি সেনগুপ্তা হয়েছিলেন। হিন্দু অধ্যুষিত তেওতা গ্রামে তখন বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বেশি ছিল। একদা অবিভক্ত বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ তথা তেওতা প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে শত শত মানিক্যস্বরূপ মানুষের জন্ম হয়েছিল। *মানিকগঞ্জের শত মানিক* শিরোনামায় বৃহৎ গ্রন্থে (সম্পাদনা মো. আজহারুল ইসলাম) সেখানকার মানবসম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেলেও তেওতা গ্রামের গিরিবালার কথা বিস্তারিত নেই। সম্প্রতি নজরুলগ্রন্থমালা স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের উদ্যোগ তেওতা গ্রামে গিরিবালাদেবীর মেয়েজামাইএর স্মৃতি সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

গিরিবালা দেবীর স্বামী বসন্তকুমার সেনগুপ্তরা ছিলেন তিন ভাই। বসন্তকুমার ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজের স্টেটের নায়েব। কেউ বলেন মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। পরে তিনি কুমিলার জেলাশাসক রায়বাহাদুর উমাকান্তের পেশকার হয়েছিলেন এবং কনিষ্ঠ ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কুমিলা জেলা আদালতে ইন্সপেক্টর ছিলেন আর জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগৎকুমার সেনগুপ্ত গ্রামে পৈত্রিক সম্পত্তির তদারক করতেন।

এইরকম একটি শিক্ষিত সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের বালিকাবধু রূপে গিরিবালা দেবীকে আমরা একটি স্থানিক ইতিহাসে প্রথম দেখি কখনো স্বামীর কর্মস্থল ত্রিপুরায় অথবা কুমিলায়। ইতোমধ্যে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এই কন্যাসন্তানটির আনুষ্ঠানিক নামকরণ করা হয় আশালতা– ডাকনাম দোলন বা দুলী। আশালতার জন্ম হয় তেওতা গ্রামে মাতুলালয়ে (মতান্তরে কুমিলা শহরের কান্দিরপাড় নামক স্থানে একটি ভাড়াবাড়িতে)। এই বাড়িতে দুই ভাইয়ের (বসন্তকুমার ও ইন্দ্রকুমার) যৌথ সংসারে দুলীকে নিয়ে গিরিবালা দেবীর অফুরন্ত সুখের দিন কেটেছে। এখানে ইন্দ্রকুমার ও বিরজাদেবীর পুত্র বীরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু সেই সুখ ও সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হল না গিরিবালা দেবীর জীবনে। হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত তীব্র আঘাতে গিরিবালা বিধ্বস্ত হয়ে যান তাঁর স্বামী বসন্তকুমার সেনগুপ্তর অকাল প্রয়াণে। তখন গিরিবালা দেবীর বয়স মাত্র ২৪/২৫ বছর। আর আশালতার বয়স ৭/৮ বছরের মত। তিনি সদ্য বিধবা হয়ে কুমিলা শহর ছেড়ে জন্মভূমিতে ফিরে আসেন কিন্তু তাঁর এমন দুর্ভাগ্য যে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। স্বামীর বাস্তুভিটেয় টিকে থাকার মত আর্থিক সংস্থান ছিল না। তাই তিনি মেয়েকে নিয়ে কুমিলায় আসেন এবং দেবর ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত এবং বিরজাদেবীর সংসারভুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন থাকেন। কুমিলা শহরের কান্দিরপাড়ে সেই ভাড়াবাড়িতে আশালতার পুনরায় লেখাপড়া ও গান শেখা শুরু হয়। তেওতা গ্রামে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়েছিল কিন্তু বিদ্যা অর্জন ও সঙ্গীতশিক্ষা কোনটাই ভালভাবে সম্পন্ন হয়নি। কুমিলার এই বাড়িতেই সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন নজরুলের বয়স ২০/২১এর মত। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর নজরুলকে দেখে সবাই মুগ্ধ হতেন। নজরুলের কবিত্বশক্তি, সঙ্গীতপ্রতিভা এবং তাঁর উন্নত ও বলিষ্ঠ দ্যুতিমান চেহারা দেখে সবাই তাকে আপন করে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হতেন। নজরুল যে মুসলমান, সুদূর বর্ধমান জেলার অচেনা গ্রামের (চুরুলিয়ায়) ছেলে, তা সত্ত্বেও তারা নজরুলকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন সহজে। সেনগুপ্ত পরিবারের প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসতেন। গিরিবালা দেবী, বিরজা দেবীকে তো নজরুল মায়ের মতই মনে করতেন। সারাজীবন মা বলেই ডাকতেন বিরজা দেবীকে।

আশালতা ও বীরেন্দ্রকে নিজের ভাইবোনের মত আপন করে নিয়েছিলেন নজরুল। আশালতা তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষাও করতেন। সেনগুপ্ত পরিবারের ভালবাসার টানে নজরুল ঘন ঘন কুমিলায় আসতেন। তখন থেকেই নজরুলের সঙ্গে সেনগুপ্ত পরিবারের একটা মধুর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্ভবত তখন থেকেই কিশোরী আশালতা মনে মনে সংগোপনে কবিকে ভালবাসতে শুরু করেন। কবির প্রতি আশালতার গোপন ভালবাসা প্রকাশ পায় যখন কবির সঙ্গে কুমিলার দৌলতপুর নিবাসী বিখ্যাত সৈয়দ বংশের পিতৃহীন কন্যা নার্গিসআসার খান মের সাদী সম্পন্ন হয়। নজরুলনার্গিসের বিয়ের তারিখ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন শুক্রবার। নার্গিস ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী আলী আকবর খানের ভাগ্নি কিন্তু এই বিয়ে স্থায়ী হয়নি। নানা কারণে এই বিয়ে ভেঙে যায়। এর ফলে কবি ও নার্গিস উভয়ই নিদারুণ মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। এই সময় ১৯২২এর *ধূমকেতু* পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমন' কবিতা। সরকার বিরোধী এই কবিতা প্রকাশের জন্য বিচারে কবির এক বছর জেল হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কবি কুমিলায় আসেন। এসঙ্গে সুলেখিকা শৈলদেবীর মন্তব্য: 'বরং এইবার সেই স্নেহ-সৌহার্দভালবাসা এত নিবিড় হইয়া উঠিল যে তাঁর সহিত আশালতার বিবাহ দেবার জন্য গিরিবালা দেবী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।'

ইতোমধ্যে নজরুলের সঙ্গে নার্গিসের বিয়ে এক প্রকার জোর করে

তেওতার জমিদারের প্রচ্ছন্ন হুমকি, নিজ জ্ঞাতি-গোত্র- আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা, এমন কি খুনের চেষ্টা ও সমালোচনা ইত্যাদি উপেক্ষা করে অসমসাহসিনী গিরিবালা দেবী নজরুলকে কন্যা সম্প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর চিন্তা ও চেতনায় বুঝেছিলেন, নজরুল মুসলমান বংশে জন্ম নিলেও সে ছেলে কোনদিন মুসলমানদের একার থাকবে না। জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের বিভেদের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার প্রতীক হয়ে সে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দু'টি সুকুমার হৃদয়ের প্রথম ভালবাসা এবং প্রণয়, ভেঙে তছনছ করে দেয় কতিপয় ধর্মগোঁড়া আত্মীয়স্বজন। তাদের অভিযোগ নজরুল নামাজ-রোজা ইত্যাদি ধর্মীয় বিধিবিধান পালন করেন না। কবি ছিলেন কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ সাহেবের ভাবশিষ্য, সাম্যবাদী ভাবধারায় অভিষিক্ত। তিনি বিদ্রোহী, স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাই, একরকম জোর করে তাঁদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কবি তখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। নার্গিসের মনের অবস্থা তখন কেমন হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয় কিন্তু তাঁর পক্ষে আত্মীয়দের অনুশাসন অমান্য করে নজরুলের কাছে চলে আসা তো সম্ভব ছিল না। এদিকে নজরুলের দৌলতপুর যাওয়া এক প্রকার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নজরুল নার্গিসকে কতখানি ভালবেসেছিলেন, পরবর্তীকালে তা বোঝা যায় নজরুলকে বলা (লেখা?) নার্গিসের একটি কথায়, 'হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে সে খুব সুখে আছে।'

তার উত্তরে কবির মর্মজ্বালা প্রকাশ পায় তাঁর বিভিন্ন লেখায়। নার্গিসের সঙ্গে বিয়ে ভাঙার ১৬ বছর পর তার অভিমানের উত্তরে কবি লিখেছিলেন, 'আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কী অসীম বেদনা, কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি সেই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না, আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।' নার্গিসের উদ্দেশে কবি লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত গান, 'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই, কেন মনে রাখ তারে। ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে'।

জেল মুক্তির পর নজরুলের প্রতি ভালবাসা নিবিড় হয়ে ওঠে গিরিবালা দেবীর। গিরিবালা দেবীর ভূমিকা তখন নজরুলের অভিভাবকের। তাঁর দূরদৃষ্টিতে নজরুল তখন ভাবীকালের মহামানব। তাই তাঁর সঙ্গে আত্মিক বন্ধন চিরস্থায়ী করার জন্য নিজের একমাত্র কন্যা আশালতাকে সম্প্রদানের জন্য গিরিবালা দেবী উঠেপ ড়ে লাগলেন কিন্তু গিরিবালার সেই প্রস্তাবে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, বিরজাদেবী এবং তাঁদের পুত্র বীরেন্দ্রকুমার এবং তাদের অন্যান্য জ্ঞাতি-গোত্র-আত্মীয়স্বজন যাঁরাই শুনেছিলেন, সকলেই বিয়ের প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করলেন। আপত্তির কারণ, হিন্দুমুসলমা নে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা কুটুম্বিতে সবই হতে পারে, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক নৈব নৈব চঃ। দ্বিতীয়ত, নজরুলের বাড়ি সুদূর বর্ধমান জেলার এক অখ্যাত গ্রামে এবং তিনি অতি গরীবের ছেলে। কলকাতায় তাঁর থাকার কোন নিজস্ব জায়গা নেই। নজরুলের নির্দিষ্ট কোন আয়-রোজগার নেই। লেখালেখিতে যৎসামান্য আয় হলেও সংসার চালাবার মত কোন রোজগার নেই। ব্রিটিশ সরকারবিরোধী উগ্র কাব্যচর্চায় কারাবাস ইত্যাদি নানা কারণে নজরুল তখন 'চলো মুশাফিরের' মত ভ্রাম্যমাণ জীবনে। এইসব কারণে গিরিবালা দেবীর আত্মীয়স্বজনেরা এই বিয়ের বিরুদ্ধাচরণ করলেও গিরিবালা দেবী নজরুলকে কন্যাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নজরুলের মধ্যে এক বিপুল শক্তির উৎস দেখেছিলেন হয়তো। হয়তো দেখেছিলেন নজরুলের মধ্যে এক অমোঘ শক্তি যার বলে সে একদিন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তাই, তিনি শত বাধার মধ্যেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি একাই লড়াই করেছিলেন। অবশেষে তিনি কন্যাকে নিয়ে বিহারের সমস্তিপুরে তাঁর ভাইয়ের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেই মত তিনি গোপনে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছলেন। তখন নজরুল থাকতেন *মোসলেম ভারত* পত্রিকার অফিসে। এসময় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন উৎসুক পাঠকের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

'শ্রীযুক্ত *আনন্দবাজার পত্রিকার* স ম্পাদক মহাশয় সমীপেষু–

মহাশয়,

বিগত ১৯ মার্চ, ১৯২৪ সাল *দৈনিক বসুমতী*তে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কলকাতা শহরে জোর গুজব উঠিয়াছে যে, *ধূমকেতু* সম্পাদক সুকবি কাজী নজরুল ইসলামের সহিত *যুগান্তর* সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ সেনের ভগিনীর বিবাহ হইতেছে। ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে বলিয়া এই প্রস্তাবিত বিবাহ সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করিলাম। অসবর্ণ বিবাহ এমনকি আন্তর্জাতিক বিবাহেরও আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়া থাকি, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ বিবেচনায় আমি এই কার্যে সহায়তা করিতে পারিতেছি না। এবং আমার জ্যেষ্ঠতম ভগিনীর বিবাহে আমার কোন কর্তৃত্বও নাই। আমার পিতা-মাতা ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাদেবী এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন নাই। নিবেদন–'

ইতি ২৪ মার্চ, ১৯২৪ সন

এই বিয়েতে সেনগুপ্ত পরিবারের অন্য সদস্যদের অমত হবার বিশেষ কারণ ছিল: তেওতার জমিদারের প্রবল বাধাদান ও আপত্তি। বিরোধিতার আরো একটি কারণ ছিল, নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে ভেঙে যাওয়াটা অনেকেই পছন্দ করেননি। অনেকেই মনে করেছিলেন তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার মূলে গিরিবালা দেবীর ইন্ধন ছিল। নজরুল ও নার্গিসের বিয়ে হয় বাংলা ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় শুক্রবার অর্থাৎ ইংরেজি ১৭ জুন, ১৯২১।

তেওতার জমিদারের প্রচ্ছন্ন হুমকি, নিজ জ্ঞাতি-গোত্র-আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা, এমন কি খুনের চেষ্টা ও সমালোচনা ইত্যাদি উপেক্ষা করে অসমসাহসিনী গিরিবালা দেবী নজরুলকে কন্যা সম্প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর চিন্তা ও চেতনায় বুঝেছিলেন, নজরুল মুসলমান বংশে জন্ম নিলেও সে ছেলে কোনদিন মুসলমানদের একার থাকবে না। জাতপাতধম ´ব র্ণের বিভেদের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার প্রতীক হয়ে সে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। নজরুলের প্রতি গিরিবালা দেবীর এমনই বিশ্বাস জন্মেছিল। তাই, নজরুলকে কন্যাদান বিষয়ে মনে মনে তিনি সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। আত্মীয়স্বজন-জ্ঞাতি-গোত্র এবং স্বজাতিদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি গৃহহীন, বিত্তহীন, ভবঘুরে নজরুলের সঙ্গে আশালতার বিয়ে দিতে পিছপা হননি।

অবশেষে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল সুকবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে কুমারী আশালতার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হল। এই হিন্দু-মুসলিমের বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নজরুলের কয়েকজন বিশেষ হিতকাঙ্ক্ষী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম মুখ্য ছিলেন সুলেখিকা এস রহমান নামে জনৈক উচ্চবংশজাত মহিলা। অলক্ষ্যে সমর্থন ও আশীর্বাদের হস্ত উত্তোলন করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ। এছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নজরুলের কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুবান্ধব সমর্থন করেন।

অতঃপর প্রশ্ন উঠল– এই বিয়ে কোন মতে হবে? আশালতার পূর্বপুরুষগণ হিন্দু থেকে ব্রাহ্ম হয়েছেন। ব্রাহ্মরা হিন্দুদের মত জাতের নামে মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন ক রে না। বিশ্বসংসারে মানুষের

> কৃষ্ণ মোহাম্মদ অকালে চলে গেল। তারপর জন্ম নিল বুলবুল। সেও চলে গেল অকালে। পরে প্রমীলা-নজরুলের আর যে দুই ছেলে হয়েছিল তাঁরাও দীর্ঘায়ু লাভ করেননি। সব্যসাচী পঞ্চাশ এবং অনিরুদ্ধ মাত্র তেতালিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাদের প্রত্যেকের সেবাযত্ন-পরিচর্যার মুখ্য ভূমিকা ছিল গিরিবালা দেবীর। সংসারের সমস্ত দায়ভার এমনকি দৈনন্দিন হাটবাজার এবং সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কেনাকাটা ইত্যাদি কাজও গিরিবালা দেবী করতেন।

একজাতি হিসাবে তারা বিবেচনা করে।

যুগান্তর সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যদিও এই বিয়ে থেকে প্রত্যক্ষভাবে দূরে ছিলেন, তবু তাঁর গোপন ইচ্ছে ছিল যে, তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে বন্ধু নজরুলের বিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত কোর্টম্যারেজ হোক। আন্তর্জাতিক বিয়ের মর্যাদা লাভ করুক। এইমতের সমর্থনে ব্রাহ্ম ও হিন্দুরা এক ছিলেন। স্বয়ং গিরিবালা দেবীও চেয়েছিলেন তাঁর মেয়ের বিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মে অর্থাৎ কোর্ট ম্যারেজ হোক। প্রসঙ্গত উলেখ করা যায়, জনৈক ধনাঢ্য মাড়োয়ারী নজরুলকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন যদি তিনি (নজরুল) আর্যধর্মমতে বিয়ে করেন। তাদের কোন মতে বিয়ে হওয়া উচিত– এপ্রশ্নে জোর তর্ক বাধে। মুসলিমবন্ধুরা বলে, হিন্দু, ব্রাহ্ম অথবা আর্য মতে বিয়ে হতে পারে না– এক হতে পারে মুসলমানী মতে অথবা সিভিল ম্যারেজ অনুযায়ী। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়কে স্বীকৃতি দিতে হবে যে 'আমি কোন ধর্ম মানি না।' এইকথায় নজরুল প্রবল আপত্তি করেন। তিনি বলেন, 'আমি মুসলমান, মুসলমানী রক্ত আমার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, এ আমি অস্বীকার করতে পারব না।' আশালতার মুসলিম ধর্মগ্রহণের কথা উঠলে নজরুল ঘোর আপত্তি করে বলেন, 'এভাবে জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করা উচিত নয়। ইচ্ছে হলে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে পরেও করতে পারবেন।'

বিয়ের নিয়মকানুন বিষয়ে তর্কবিতর্কের মধ্যে নজরুলের ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর কিছু ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বন্ধু ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। কারণ, হিন্দুমুসলিম সকলেই জানতেন নজরুল কোন ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নেই। তিনি মানবতাবাদী কবি। তিনি সাম্যের গান গান। তিনি এক নতুন ধর্মবোধের অন্যতম প্রবর্তক হতে চলেছেন। তিনি লিখছেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুসলিম সমাজের লোক বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে ২৫ এপ্রিল ১৯২৪ নজরুলের ইচ্ছামত মুসলিমরীতি অনুসারে তাঁর সঙ্গে আশালতা দেবীর বিয়ে হয়। বিয়ের আসরে আশালতা দেবীর নাম পরিবর্তন করে নজরুল নাম রাখলেন কাজী প্রমীলা ইসলাম।

অবশ্য আবু মোহম্মদ জাহিরুল হাসানের মতে, নজরুলপ্রমীলার বিয়ে হয়েছিল আহলুল কেতাব অনুসারে। আহলুল কেতাব অর্থ আলাহ প্রদত্ত বাণীগ্রন্থ। ইসলামিক শরিয়তি মতে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী উভয়কে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হতেই হয় কিন্তু নজরুলের ঘোর আপত্তিতে তাঁদের বিয়ের সময় প্রমীলাকে ধর্মান্তরিত হতে হয়নি। তাঁদের নিজ নিজ ধর্মমতে থেকে বিয়ে হয়েছিল আহলুল কেতাবের সিদ্ধান্তমতে। এই নিয়মে বলা হয়েছে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের সঙ্গে একজন অমুসলমানের বিয়ে হতে পারে। সম্ভবত এদেশে নজরুল-প্রমীলার বিয়েই প্রথম মুসলমানের সঙ্গে অমুসলমানের (হিন্দুর) বিয়ে।

নজরুলপ্রমীলার বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, তাঁদের বিয়ে হয়েছিল স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে। (ড. তারক সরকার) স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট মেনে তাঁদের বিয়ে হয়ে থাকলে ম্যারেজ সার্টিফিকেট থাকার কথা। তাছাড়া ১৯২৪ সালে কোর্ট ম্যারেজের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রপাত্রী প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত সেক্ষেত্রে প্রমীলা অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন।

এই বিয়ে নিয়ে ঝড় উঠল বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক মহলে। সে অনেক দীর্ঘ ও তিক্ত ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে থেকে গিরিবালা দেবী তাঁদের সুখশান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে লড়াইসংগ্রাম করেছিলেন, তার কোন তুলনা হয় না। জামাইমেয়েকে নিয়ে বারবার তাদের ভাড়াবাড়ি পাল্টাতে হয়েছে। কখনো হিন্দুপাড়ায় কখনো মুসলমান পাড়ায়, কখনো কোন অজ্ঞাত জায়গায়, কখনো মফস্সলে, কখনো কলকাতার বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়েছে। তাঁদের সংসার পরিচালনার সমস্ত দায়িত্বভার গিরিবালা দেবী কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। গিরিবালা দেবী মুসলমান জামাইয়ের সংসারে থেকে হিন্দু বিধবার সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতেন।

প্রমীলার প্রথম পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে বাংলা ১৩৩১ সালের জন্মাষ্টমীর দিন (শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি)। তাই সম্ভবত গিরিবালা দেবী নবজাতকের নাম রাখেন কৃষ্ণ মোহাম্মদ এবং নজরুল নাম রাখেন আজাদ কামাল। তাদের এই পুত্রের 'আকিকা' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ডা. মো. লুৎফর রহমান, মইনুদ্দিন হোসেন, মো. ওয়াজেদ আলী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, জসীমউদ্‌দীন, দীনেশ দাস, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ খ্যাতনামা কবিসাহিতি ক ও বুদ্ধিজীবী। কিন্তু কৃষ্ণ মোহাম্মদ অকালে চলে গেল। তারপর জন্ম নিল বুলবুল। সেও চলে গেল অকালে। পরে প্রমীলানজর লের আর যে দুই ছেলে হয়েছিল তাঁরাও দীর্ঘায়ু লাভ করেননি। সব্যসাচী পঞ্চাশ এবং অনিরুদ্ধ মাত্র তেতালিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাদের প্রত্যেকের সেবাযত্নপরিচর্যার মুখ্য ভূমিকা ছিল গিরিবালা দেবীর। সংসারের সমস্ত দায়ভার এমনকি দৈনন্দিন হাটবাজার এবং সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কেনাকাটা ইত্যাদি কাজও গিরিবালা দেবী করতেন। তখন নজরুল প্রায়ই সময় পেতেন না। তিনি সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা এবং পত্রিকা সম্পাদনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর সংসার পরিচালনা করার মত সময় ছিল না। তাঁকে প্রায়শই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হত। সারা বাংলায় বিশেষত পূর্ব ও উত্তর বাংলায় তখন তাঁর চাহিদা প্রবল, তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বিপুল। তাঁর ঘরে থাকা বা সংসার দেখাশোনার সময় খুবই সীমিত হয়ে যায়। তাঁকে প্রায় উল্কার মত ছুটে বেড়াতে হত বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে। এই সব দিনে নজরুলের সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব গিরিবালা দেবী বহন করতেন। তাছাড়াও নজরুলের বার বার বাড়ি পাল্টানোর স্বভাব ছিল। এক বাড়িতে তিনি বেশিদিন থাকতে চাইতেন না; এমন কি এক অঞ্চলেও বেশিদিন থাকতেন না। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ নজরুলপ্রমীলার বিয়ের পর থেকে গিরিবালা দেবীর অন্তর্ধান রহস্য পর্যন্ত কবি কম করেও তের-চোদ্দবার ভাড়াবাড়ি পাল্টাপাল্টি করেছিলেন। এসব ঝক্কিঝামেলাও গিরিবালা দেবী সামলেছেন।

প্রমীলা ১৯৩৮ সালে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রীকে সুস্থ করে তুলতে নজরুল দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, সাধুসন্ন্যাসী, পীরদর বেশ, মন্দিরমসজিদমাজার, তাবিজকবচ, ঝাড়ফুঁক ইত ্যাদি গ্রাম্য কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। স্ত্রীর আরোগ্য লাভের জন্য তিনি আধিদৈবিক আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম অনেক কিছুই করেছিলেন। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁর মোটরগাড়ি ও বালিগঞ্জের জমি বিক্রি করে দিলেন। গানের রয়্যালটির টাকা অপরের কাছে বন্ধক রেখে অগ্রিম টাকা ধার নিয়ে নিঃস্ব হলেন।

এই প্রসঙ্গে পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের লেখা থেকে জানা যায়, কোন এক দরবেশের পরামর্শে নজরুল শত বছরের কচুরিপানা ভর্তি এক অতি

পুরনো পচা ডোবায় সন্ধ্যা থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত শরীর নিমজ্জিত রেখে দরবেশের তাবিজ নিয়ে প্রমীলাকে ধারণ করিয়েছিলেন। প্রমীলাকে সারিয়ে তুলতে নজরুল প্রায় পাগলের মত ছোটাছুটি করতেন। তখন তাঁর সাহিত্যসঙ্গীতচর্চা এবং আয়-রোজগার ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। অবশেষে ১৯৪১ সালের শেষের দিক থেকে নজরুল ধীরে ধীরে সম্বিতহারা হতে হতে চিরনির্বাক হয়ে গেলেন। তাঁরই লিখিত বাণী তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠল,

'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু
আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি' সারা দিনমান
কারো ধ্যান ভাঙিব না
... নিশ্চল, নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী
গন্ধবিধুর ধূপ।'

নজরুলপত্নী মীলার শরীরে ও সংসারে এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। পক্ষঘাতগ্রস্ত মেয়ে, সম্বিতহারা জামাই এবং দু'টি নাবালক নাতি নিয়ে গিরিবালা দেবী যে কী মহাদুর্দিনে পড়েছিলেন, তার কিছু বিবরণ বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়। তিনি নিজে হিন্দুবিধবা হিসাবে আহারে ও পরিধানে খুবই সংযত ও সাত্ত্বিক ছিলেন। গিরিবালা দেবী সম্পর্কে বিশিষ্ট নজরুলগবেষক আজহারউদ্দিন খান লিখছেন, 'কবি-পরিবারে গিরিবালা দেবী পক্ষীমাতার মত সকলকে আগলিয়ে রাখতেন, কিন্তু কবির অসুস্থতার পর গিরিবালা দেবী সম্পর্কে নানাজনে নানাকথা বলতে শুরু করেন। তিনি নাকি জামাইয়ের রয়ালটির সব টাকা জমিয়ে রাখেন, জামাইয়ের চিকিৎসা করান না, ভাল খেতে দেন না, কবির নামে যা কিছু সাহায্য আসে তা তিনি আত্মসাৎ করেন ইত্যাদি। এসব কথায় তিনি প্রচ- আঘাত পেতেন। তিনি অতি দুঃখে ক্ষোভের সাথে বলতেন, এভাবে দুর্নামের বোঝা নিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে করে না, কোনদিন চলে যাব দু'চোখ যেদিকে যায়।'

অসুস্থ মেয়েজামাই য়ের নোংরা জামাকাপড় বিছানাপত্তর তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার করতেন। এমনকি তাদের মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করে তাদের পরিচ্ছন্ন রাখতেন। ঘরের সব কাজ সেরে, রান্নাবান্না করে, তাদের খাইয়ে, বিকেলে স্নানাদি সেরে পূজার্চনা করে নিজের নিরামিষ আহার তৈরি করে খেতেন।

গিরিবালা দেবী সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, "যখন কন্যা পড়াঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন, যখন জামাতা জ্ঞান হারালেন তখন এই রুগী দু'টির সমস্ত পরিচর্যা এবং সন্তান দু'টির দায়িত্ব তিনিই বহন করে চলতেন। পলীকবি জসীমউদ্‌দীন গিরিবালা দেবীকে খালা আম্মা বলে ডাকতেন। তিনি গিরিবালা দেবী সম্পর্কে লিখলেন, 'একদিন বেলা একটার সময় কবিগৃহে গমন করিয়া দেখি খালা আম্মা বিষণ্ন বদনে বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার মুখ আজ বেজার কেন?

খালা আম্মা অভিমানে বলিলেন, জসীম তোমরা জানো, সব লোকে আমার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। নুরুর (নজরুল) নামে যেখান থেকে যত টাকাপয়সা আ সে, আমি নাকি সব টাকা বাক্সে বন্ধ করে রাখি। নুরুকে ভালমত খাওয়াই না। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না। তুমি জানো, আমার ছেলে নেই। নুরুকেই আমি ছেলে করে নিয়েছি। আর আমিই বা কে? নুরুর দু'টি ছেলে আছে। তারা বড় হয়ে উঠেছে। আমি যদি নুরুর টাকা লুকিয়ে রাখি, তারা তা সহ্য করবে কেন? তাদের বাপ খেতে পেল কি না– তারা কি চোখে দেখে না? নিজের ছেলের চাইতে কি কবির প্রতি অপরের দরদ বেশি? আমি তোকে বলে দিলাম জসীম, এই সংসার থেকে একদিন আমি কোথাও চলে যাব। এই নিন্দা আমি সহ্য করতে পারি না।' এই বলিয়া খালা আম্মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'খালা আম্মা কাঁদবেন না। একদিন প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হবেই।' খালা আম্মা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, যে ঘরে নজরুল থাকিতেন সেই ঘরে। দেখিলাম কবি পায়খানা করিয়া কাপড়জামা সমস্ত নোংরা করিয়া বসিয়া আছেন। খালা আম্মা বলিলেন, 'এইসব পরিষ্কার করে আমি হিন্দু বিধবা তবে রান্না করতে বসব। খেতে খেতে বেলা পাঁচটা বাজবে। রোজ এইভাবে তিন চারবার পরিষ্কার করতে হয়। যারা নিন্দা করে তাদের বল, তারা এসে যেন এই কাজের ভার নেয়। তখন যেখানে চক্ষু যায় আমি চলে যাব।"

সত্যসত্যই একদিন কবি জসীমউদ্‌দীনের খালা আম্মা (মাসিমা) গিরিবালা সেনগুপ্তা কোথায় চলে গেলেন, কিছুতেই তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন তাঁরা থাকতেন শ্যামবাজার এলাকায়। সেখানে থেকে তিনি একদিন চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন। তখন ১৯৪৬ সাল, কলকাতায় হিন্দুমুসলমা নের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গাহা ঙ্গামা খুনখারাি ব চলছিল। এইরকম এক ভয়ানক সময় তিনি একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেন। শতচেষ্টায়ও তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের বিধবা নিজের মেয়েটির হাত ধরে সমাজের নিন্দা ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে একদিন ছন্নছাড়া নিঃস্ব কবি নজরুলের সঙ্গে অকূলে ভেসেছিলেন। নিজের সমাজের কাছে আত্মীয়স্বজনদের হাতে সেদিন তাঁর গঞ্জনার সীমা ছিল না। সেই লাঞ্ছনা গঞ্জনা তিনি তুচ্ছ তৃণের মত গণ্য করেছিলেন। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন এবং দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে নজরুল কাব্যকথায় যুগযন্ত্রণার বিরুদ্ধে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তাঁর কীর্তি কালোত্তীর্ণ হবে। নজরুল হিন্দু মুসলিম জাত্যাভিমানের উর্ধ্বে এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা। গিরিবালা দেবীর গভীর মমতা ও দুঃসাহসিক আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

অতুল পাল ভারতের প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

লোকগীতির সুরবৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথ

ড. আবদুল ওয়াহাব

সুর জাতি পরিচয়ের অন্যতম শৈল্পিক বাহন। সুর-এর উদগাতা হচ্ছে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতায় উদ্ভূত সামাজিক জীবন। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে জীবন সংগ্রামের তথা জীবনযাপনের কাঠিন্যতা সহজতা, উৎপাদন কৌশল, নদীবহুলতা, পাহাড়-পর্বত, উঁচুনিচু অসমভুমি, সমুদ্র তটরেখা, উষ্ণ অথবা শীতল অথবা নাতিশীতোষ্ণতা প্রভৃতির ভিত্তিতে শ্রমজীবনের অনুষঙ্গে পৃথিবীতে সুর-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প লোকগীতির মধ্যে এটা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়। লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত মাধ্যমের মধ্যে এতটা জীবননিষ্ঠ শিল্প আর দ্বিতীয়টি নেই। এ শিল্পে রয়েছে শ্রম, শ্রমজীবন এবং শ্রমজীবী মানুষদের প্রবঞ্চনার ইতিহাস। এ গানে শ্রমজীবী মানুষ স্বয়ং রচনাকর্মের অন্যতম সহযোগী। যদিও এ গান প্রধানত তাদের অনুমোদনকৃত লোককবি তাদের হয়ে রচনা করেন; কিন্তু তথাপিও তাদের অনুমোদন বা স্বীকৃতি ছাড়া এ গান লোকগীতি হিসেবে নাম জারি করতে সমর্থ হয় না। লোকসমাজ কর্তৃক একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেতে হবে; কোন চোরাগলিতে এর অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়, কোন ছলচাতুরি বা জোর-জবরদস্তি এখানে খাটে না– কেন না 'লোক' যতক্ষণ না হ্যাঁ বলছে ততক্ষণ এ লোকগীতি নয়। এই লোক হচ্ছে সংশি-ষ্টঅঞ্চলের স্থানীয় কর্মজীবী-শ্রমজীবী মানুষ। এ গানের সুর-কাঠামোর ভর ঐ শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষ।

কোন একটি গান কোন জনগোষ্ঠীর কাছে তখনই স্বীকৃত হয় বা জনপ্রিয় হয় যখন ঐ গানের কথায় এবং ভাষায় স্বীয় জনগোষ্ঠীর জীবনশৈলী উপলব্ধ হয়, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনানুভূতি ঐ গানের বক্তব্যে প্রস্ফুটিত হয়, কেবল সে গানই ঐ জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচিত ও চয়িত হয়। গানের কথায় আম-জনতার জীবনসংগ্রামের প্রতিচ্ছায়া না থাকলে ঐ গান অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পারম্পর্য হারায়, জনগণ কর্তৃক বর্জিত হয়, পরিত্যক্ত হয়, সুতরাং ঐ গানটি চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

অর্থাৎ একটি লোকসমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি পেতে হলে ঐ গানের বক্তব্যে অবশ্যম্ভাবী- ভা বে সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনানুভূতির বহিঃপ্রকাশ থাকতেই হবে এবং গানের ভাষাশৈলীতেও থাকতে হবে আঞ্চলিক ভাষার ছোঁয়া, আর সুর তো নিঃসৃত হবে জনগণের কণ্ঠ থেকে– লোকগীতির গঠনরীতিই এই– এটা লোকগীতির আঞ্চলিক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য। লোকগীতিকে এভাবে পরীক্ষিত ও লোকসাধারণের জীবনরসে জারিত হয়েই আসতে হবে, তখনই হবে সেটি লোকগীতি। 'লোক' যাকে গ্রহণ না করে সেটা লোকের হয় কি করে? এটাতো স্বতঃসিদ্ধ কথা– যার মধ্যে 'লোক' নাই সেটা লোকগীতি নয়– আর 'লোক' থাকার অর্থটা হচ্ছে লোকের জীবন থাকা, জীবনের ভাবনা থাকা, জীবনের জয় থাকা, জীবনের পরাজয়ের মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকা অর্থাৎ সুন্দর জীবন গড়ার, সমাজ গড়ার স্বপ্ন থাকা। তবেই সে গান এগিয়ে যাবে কাল থেকে কালে, এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে, আর ঐ গানের বক্তব্যে পাওয়া যাবে সংশিষ্ট লোকগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, তাদের জীবন সংগ্রামের আদিঅন্ত– এভাবে উন্মোচিত হবে তাদের নৃইতিহা সের গ্রন্থি।

লোকগীতি রচয়িতা সাধারণত নিরক্ষর লোককবি, আর নিরক্ষর না হলেও উচ্চশিক্ষা অর্জনকারী নন। রচয়িতা লোককবি এবং সংশিষ্ট জনসাধারণ লোকগীতির সুরকার, স্বাভাবিকভাবে সেখানে অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রকাশই লক্ষ্য করা যায়। লোকগীতির আবেদন তার সহজ কথা ও সহজ সুরকর্ম সংশিষ্ট জীবনঘেঁষা সুর। সহজভাষা, আঞ্চলিক উচ্চারণ ও সহজসরল সু রের স্বতঃস্ফূর্ততা সংশিষ্ট জনসাধারণের মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে। সুরের আবেদন সার্বজনীন (Universal) হলেও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার সংশিষ্ট অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ লোকগীতির আলোচনায় সুরই মুখ্য। সঙ্গীত যেদিন একটি আদিম মানবগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে প্রথম বিকশিত হয়েছিল– সেদিন সঙ্গীতের একটি সামগ্রিক গোষ্ঠী রূপ ছিল এবং সুর একটি নৃ-গোষ্ঠীর সুর হিসেবেই পরিচিত ছিল। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশপ্রতিবেশ ও সেই সুবাদে উৎপাদন পদ্ধতির কারণে নৃপরিচ য়ের বৈশিষ্ট্যগুলোও যেমন স্পষ্টতর হচ্ছিল এরই সঙ্গে সুর ছিল এক বিশেষ সহযোগী। তবে একথাও স্মরণীয় যে খণ্ড খণ্ড জাতিগোষ্ঠী যাদের জীবনসংগ্রামের অনেক কিছুতেই রয়েছে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তাদের নিয়ে কালক্রমে গড়ে উঠে জাতীয় রাষ্ট্র কাঠামো। এক্ষেত্রে কিন্তু সুরের বেলায়ও একই কথা খাটে। ভৌগোলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও কাছাকাছি বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সুরেরও একটা মেলবন্ধন ঘটে; সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মত সুরেরও লেনদেন চলে, কোন কোন সুর হয় ব্যাপক প্রভাব বিস্তারি, এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তার চলে। আমাদের বাউল সুর ভাটিয়ালি সুর এমনকি ভাওয়াইয়া সুরের ক্ষেত্রেও একথা সর্বৈব প্রযোজ্য। লোকগীতির সুর প্রসঙ্গে গৌরী ভট্টাচার্য বলেন:

'যে কোনো গানেরই মুখ্য উপাদান হচ্ছে সুর। সুর ছাড়া গান হয় না। সুর আবার দু'রকমের হয়ে থাকে– প্রাকৃত এবং কৃত্রিম। প্রাকৃত সুর শিক্ষানির পেক্ষ এবং সহজাত। কিন্তু কৃত্রিম সুর বুদ্ধিমান মানুষের ভাবনাপ্রসূত। আদিবাসীদের গানের সুর প্রাকৃত। লোকগীতির সুরও তাই। কিন্তু নাগরিক গান, শাস্ত্রীয় গান প্রভৃতির সুর বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত স্বরসমূহকে অবলম্বন করেই সুরকার সৃষ্টি করে থাকে। নাগরিক বা অভিজাত গানে স্বর ও সুর থাকে। কিন্তু আদিবাসীদের গানে কিংবা লোকগীতিতে থাকে শুধুই সুর। সুরের একক অংশই হচ্ছে স্বর। অভিজাত গানে সুরের এই এককে সা রে গা মা প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আদি উপজাতীয়দের গানে সা রে গা মা ইত্যাদি হয় না। অবশ্য কিছু তরুণ 'অতিগ বেষক' দেশীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পড়ে বুঝতে না পেরে ইংরেজদের লেখা বই পড়ে আমাদের লোকগীতির সুরকে কম্পাঙ্ক, তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা প্রভৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এঁরা সম্ভবত ভুলে যান আঞ্চলিক ধ্বনি বা দেশিধ বনি অঞ্চল-ভেদে এবং ভঙ্গি-ভেদে, এমনকি একই অঞ্চলের সময়-ভেদেও, ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এদের স্কেল দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। বাঁধতে গেলেই সে আর লোকগীতি থাকবে না, হয়ে যাবে অভিজাত গান কিংবা নাগরিক গান। এই জন্যই লোকগীতির সুরকে বলা হয় ধ্বনি, অর্থাৎ চলতি কথায় 'ধুন'। লোকসুর বা ধুন মাটি (ভূমি) থেকে জন্মায় বলেই ভূমির প্রকৃতি ভেদে সুর-কাঠামোর প্রকৃতিও আলাদা হয়ে যায়। আমরা যদি বাংলার 'মাটির সুর' খুব মন দিয়ে শুনি তাহলে সহজেই বুঝতে পারব বাংলার পশ্চিমাংশের রুক্ষ মাটিতে লোকসুরগুলি 'সা রা গা পা ধা না ধা পা গা পা গা রা সা' অর্থাৎ আধুনিক দৃষ্টিতে 'মা'বর্জিত সব শুদ্ধ-স্বরের মতন। তবে মাঝে মধ্যে ক্বচিৎ অবরোহে 'শুদ্ধমা ' এর মতন স্বর যে লাগে না তা নয়। বাংলার প্রাচীন 'দেশকার' রাগ এই সুরকাঠা মো থেকেই জন্মেছিল। বীরভূমবাঁকুড়ার বাউলগা নের সুরেও আপনারা আজও এই সুরকাঠামোকে পাবেন। অন্যদিকে, নরম মাটি, জলাভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে সুরের যেকাঠা মো আমাদের কানে ধরা পড়ে সেটা হল– 'সা রা মা পা ধা না ধা পা মা গা গা রা সা'। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের লোকগীতিতে আপনারা এই সুরকাঠামোকে খুঁজে পাবেন। এক সময়ে বাঙলায় অধিক প্রচলিত 'ঝিন্‌ঝোটী'বা 'ঝিঁঝিট' রাগের সঙ্গে এই সুরকাঠা মোর মিল লক্ষ্য করা যায়।'

সুর ও ভাবের অকৃত্রিমতায় লোকগীতি বাংলার অমূল্য সম্পদ। বাংলার লোকগীতির বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রাচীন যুগের কৌমসমাজ, ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী, তাদের জীবনযাপন, তাদের সামাজিক বিকাশ এবং সামগ্রিকভাবে বাংলার গণসংস্কৃতির পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আমরা আজকের যুগে পরিশীলিত সঙ্গীতের যে রাগরাগিণী এবং তার সপ্তস্বরের সমাহার দেখি তাতে অনেক পণ্ডিতই একমত যে এগুলো লোকগীতির বিচিত্রতর সুর-বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপ। বর্তমান কালের গবেষণায় অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন লোকগীতির উপর ভিত্তি করেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণী উদ্ভূত হয়েছে। লোকগীতির কথ্য ভাষা, সরল পদবিন্যাসরীতি, সরলসহজ সুর লোকসমাজে সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সম।

সুর, স্বর ও ভঙ্গি এ তিনটি অনুষঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লোকগীতির প্রাণস্বরূপ। এ তিনটির মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় বিভিন্ন উৎপাদনশীল শ্রমপ্রক্রিয়ায় আবদ্ধ সমষ্টি জীবনের অভিব্যক্তি। লোকগীতির সুর, স্বর ও ভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠে বিশেষ কোন নৃ-গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের চিত্র। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে গঠিত স্বর ও বাকভঙ্গির বিশিষ্টতা, এটা লোকগীতির আঞ্চলিকতা। ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতায় গঠিত উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন কৌশলের ভিত্তিতে স্বর ও বাকভঙ্গির বিভিন্নতা ও বিশিষ্টতা চিহ্নিত হয়। লোকগীতির গ্রামীণ সরলতা, আঞ্চলিক বাকভঙ্গি ও গায়কী ঢঙের সঙ্গে আরও যুক্ত আছে ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)। স্বরের আরোহণঅব রোহণ, সম্বাদী ও বিসম্বাদীর টানাপোড়েনে এক একটি নৃজাতির লোকগীতিতে এমন একটি melodic pattern বা সুরনক্সা তৈরি হয় যে সেই বিশেষ নৃজাতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, তাদের সামাজিক জীবনে সেই সুরটি জড়িয়ে থাকে। যতই তার নানা রকমের গান থাক না কেন, ঐ চিহ্নিত সুরটি ফ্রেম থেকে যেন যে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। এই পিছুটান তার থাকবেই। সেই ভৌগোলিক সীমা ও ভাষা একটি জাতির মৌল দিক– সেটাই তার মূল সুর। বৃহৎ বাঙলায় উত্তরবঙ্গ এবং অসমের তৎকালীন কামরূপের যেমন ভাওয়াইয়া; পশ্চিমবঙ্গ, স্বাধীন বাংলাদেশের সমগ্র কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুরের কিয়দংশ, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহের কিয়দংশ জুড়ে যেমন বাউল; ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কুমিলা, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা জুড়ে যেমন ভাটিয়ালি তার সেই melodic structure-এ প্রত্যেকটি জাতি, ক্ষুদ্র জাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর এক একটা বিশেষ পরিচিতি বহন করছে– যাকে আমরা সেই অঞ্চলের যৌথ 'পক্ষ' বলতে পারি। লোকগীতির বৈশিষ্ট্য বিচারে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন, 'তার মূল বিষয় আঞ্চলিক গায়কী, স্বরের রূপভেদ বা timbre, আঞ্চলিক চলনভঙ্গি, ছন্দ ও উপভাষাগত ফোনেটিক্স বা ধ্বনিবিজ্ঞান ও intonation বা বাকভঙ্গি ইত্যাদি।' হেমাঙ্গ বিশ্বাস সুরের দিক থেকে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভাজন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

'শ্রীহট্টের সুর বলে কি কোনো সুর আছে? বাংলাদেশকে যদি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করি সুরের দিক থেকে– তাহলে বলতে পারি, পূর্ববঙ্গ ভাটিয়ালিপ্রধান, উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়াপ্রধান এবং মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ

বাউলপ্রধান। কিন্তু ভাটিয়ালিপ্রধান পূর্ববঙ্গকে আবার সূক্ষ্ম সুরবিচা রে মোটামুটি জেলাগত অনুবিভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা যারা পূর্ববঙ্গের সুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সেই অঞ্চলের গান শুনলেই অমুক ঢঙটা ময়মনসিংহের, অমুক ঢঙটা ত্রিপুরার, অমুক ঢঙটা শ্রীহট্টেরইত ্যাদি বলতে অভ্যস্ত। কী পদ্ধতিতে এই ভাগটা করে থাকি? কোন বৈজ্ঞানিক রাগবিশেষণে মোটেই নয়, –কেবলমাত্র 'তৈরি কান' দিয়ে। কোন বিশেষ ঢঙ, বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ গায়কীতে এমনি একটা আঞ্চলিকতা মিশে থাকে এবং তা শুনতে শুনতে এমনি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে এই সুরবিচা রে কোন দিন বুদ্ধিগত বিশেষণের চেষ্টা করিনি। কাজেই, এই স্বভাব-স্বীকৃতিগুলোকে ব্যাকরণস ম্মত আলোচনায় দাঁড় করানো সত্যি অতি দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া, গান গেয়ে দেখানো যেমন সহজ, লিখে– এমনকি, স্বরলিপি করেও তা প্রমাণ করা তেমন সহজ নয়। স্বরলিপিতে পলিসঙ্গীতের ঢঙ ও শ্রুতির মাধুর্য কোনদিনই ধরা পড়ে না।'

লোকগীতির নানা ভাগ। মাঠের গান, নদীর গান, বাটের গান, আঙ্গিনার গান। আবার নদীর গান আর মাঠের গান এক নয়। উত্তরবঙ্গের মাঠের গান থেকে পূর্ববঙ্গের মাঠের গানের গায়কী রীতি ভিন্ন। আবার পূর্ববঙ্গের নদীবহুল নাব্য অঞ্চলের নিজস্ব সুর ভাটিয়ালি–ভাটিয়ালি সুরের বৈশিষ্ট্যে আছে জলকম্পনের রেশ। আবার একই ভাবের গান আঞ্চলিক ও কথ্য ভাষার পদ ব্যবহারের ফলেও দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। লোকগীতির কথ্য ভাষা, পদবিন্যাস রীতি, সহজ-সরল সুর, লোক সমাজের জীবনভাবনা অতি সহজেই মানুষের মধ্যে সংবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। লোকসমাজ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত সৃষ্টি বলেই লোকগীতির সুর স্বতঃস্ফূর্ত এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। পদসংযোজনায় ব্যাকরণের অনুশাসন নেই। অর্থের পারম্পর্য রেখে সমকালের একগুচ্ছ শব্দ উচ্চারণ করে শেষ বর্ণে হয়তো দীর্ঘ সুর আরোপ করে। সে সুরের রেশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলে। এ বৈশিষ্ট্য ভাটিয়ালি গানে সম্ভবপর। কখনো আবার পদবিন্যাসের বৈচিত্র্য হেতু একই বিষয় বা আখ্যানে সুর বিভিন্নভাবে গীত হয়। প্রথাগত আচারউৎসব, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা, পার্থিব ও লৌকিক জীবনচিন্তা, সামাজিক জীবন ও দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের নানা মাত্রিকতা লোকগীতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রায় প্রত্যেক প্রকৃতির গানই জটিলতা বিবর্জিত সরল সুরে গীত হবার কারণে মানুষের মনকে দোলা দেয়। বাংলায় সুর বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের মাঠের গান আছে, বাটের গান আছে, নদীর গান আছে, বিল হাওড়ের গান আছে, আছে বৈষ্ণব ভিখারির গান, বাউল ভিখারির গান, আছে কৃষকের গান, আছে রাখাল বালকের গান, আছে বিয়ের গান, কবিগান, যাত্রাগান, জারিগান, সারি গান– দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি হাজারও বিষয় নিয়ে রয়েছে হাজার প্রকৃতির গান।

স্থান কালভেদে লোকগীতির কথা, সুর ও তালল য়ের যে তারতম্য ও ভেদরেখা রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। স্রোতের টানে নৌকা বাওয়া, পাল তুলে নৌকা বাওয়া, চাষীদের ধান নিড়ানি, ধান কাটা, পাট কাটা, রাখালের গরু চরানো, মৈষালের মহিষ চরানো, গাড়োয়ানের গাড়ি চালানো, মেয়েলি গান, বিয়ের গান এসব ক্ষেত্রেই পরিবেশের প্রভাবে সুরের এবং কথার বৈচিত্র্য, ভাবের বৈচিত্র্য লোকগীতির আবেদনকে আরো গভীর, হৃদয়গ্রাহী ও সার্বজনীন করেছে। সার বেঁধে ধান কাটার সময় চাষী গান গায়– বারাসে, ভাওয়াইয়া, চটকা বা সমবেতভাবে পালাগান। আবার কখনো গৃহপ্রাঙ্গণে, গৃহাভ্যন্তরে বা বাড়ির আশেপাশে সামিয়ানা টানিয়ে একক এবং সমবেতভাবে গাওয়া হয় পালাগান, কবিগান, ফকিরি গান, বাউল গান, পুঁথিপাঠের গান– তার পরিবেশ এবং শ্রোতৃবৃন্দ পৃথক। এগুলো গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ, আমজনতার নান্দনিকতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, গণসংস্কৃতির এক স্বতঃপ্রণোদিত রূপ। প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাব ও রস সৃজনের কত সহায়ক হয়ে থাকে তার দৃষ্টান্ত মেলে ভোর রাত বা উষাকালে যখন প্রকৃতি শান্তনি স্তব্ধ এমনি পরিবেশে হঠাৎ শুনতে পাওয়া যাবে নৌকার কোন মাঝি অথবা রাতের মাছ শিকারি ক্লান্তপরিশ্রান্ত জেলে গাইছেন:

'দাও খুলে দাও মন্দিরার কেয়ার
লাগুক শীতল হাওয়ারে।
রাত তুই যারে যা পোহায়ে ॥

অথবা সন্ধ্যারাতে– রাতের প্রথম প্রহরে দেখা গেল লণ্ঠন (হারিকেন) জ্বালিয়ে অথবা পাটশলার গোছাতে আগুন জ্বালিয়ে পল দিয়ে নদীর কিনারে মাছ ধরছে। খাদ্যানুসন্ধানী কিনারে আসা মাছের চোখে আলো ফেলে মাছের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে পল ফেলে মাছ শিকার করছে অথবা খেয়া জাল ফেলে মাছ ধরছে– কিছুকাল আগে পর্যন্তও এ দৃশ্য অহরহই দেখা গেছে, বিশেষত নদী পাড়ে বসবাসকারীরা এভাবে মাছ শিকার করত। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শব্দ হচ্ছে:

ঝাকিজাল: কপাত কপাত
পল: ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্

ঊষাকালে নদীর ধার ঘেঁষে আসছে গাঁয়ের ব্রত পালনকারী বালিকার দল। তাদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠে নদীর ঘাট। ঘাটে বসে মেয়েরা সূর্যের উদ্দেশে তর্পণ করে। ভেসে আসে তাদের সমস্বরে গাওয়া গান:

উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
নৌকার মাঝি গেয়ে উঠে:
সুখ নাইরে সুখ পরাণের সারি
জিলায় জিলায় সুখের আশায় ঘুরি ফিরি
মরি তবু সুখ নাইরে।

সাঙ্গীতিক গঠনবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাঙলার লোকগীতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোন কোন গান টানা সুরে। কোন কোন গানের সুরে রয়েছে আবৃত্তির ঢং। সুরে মিশে থাকে রাখালের গরু চরানো, গাড়োয়ান ভাইয়ের গরু-মহিষের চলার মন্থর গতি। মাঠের কৃষক ও নৌকার মাঝির একটানা হৃদয়স্পর্শী সুর– বাংলার নদীহাওড়, শ স্যে ভরা সবুজশ ্যামল মাঠের হাতছানি ও উদাসভাব ফুটে ওঠে লোকগীতির সুরে ও কথায়।

লোকগীতির সুর যে গতানুগতিক, সমাজ প্রবাহের সঙ্গে তার সম্পর্ক ওতপ্রোত, সমাজ জীবন থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এর সৃষ্টি একথা স্পষ্টত বোঝা যায় লোকগীতি রচনা ও তার পরিবেশনায় লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ড. আশরাফ সিদ্দিকী মন্তব্য করেন, 'লোকগীতির এ 'continuous circle'এর মূল হ চ্ছে তার traditional সুর। জনজীবনের সঙ্গে তাদের কর্মবি নোদন, তাদের আশানিরাশাপ্রত্যাশা এই সুরের সাথে সম্পর্কিত; যেন তারা জীবনের পরম আশ্রয় খুঁজে পায় এ সুরে। আর পাবেই না বা কেন– এ সুর তো তাদেরই হৃদয়স্পন্দিত– তাদের প্রাণস্পন্দনই এর উদ্গাতা। তাদের জীবন তো বহু শতক ধরে একই প্যাটার্নে বাঁধা– গতানুগতিকতা এ জীবনের এক প্রধান অনুষঙ্গী, এরই ফলে একই সুর বহু শতক ধরে একইভাবে গীত হয়ে চলেছে। লোকগীতির এ ধরনের নির্দিষ্ট সুরকে কঙ্কন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'একক সম্পূর্ণ সুর বা Unitary tune। তাঁর মতে নানা ধরনের বক্তব্য ও ভাবকে বহন করার এক অসাধারণ ও অপূর্ব ক্ষমতা আছে এ সুরের। এতে কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা করলে লোকসমাজই তা প্রতিহত করে এবং লোকসমাজ দ্বারাই তা পরিত্যক্ত হয়।

লোকগীতির প্রকার অনুযায়ী তার সুর-বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট। সুরের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে লোকগীতি গাওয়া চলে না। বিশেষত আঞ্চলিক পরিভাষাসহ, আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি, গায়কী ঢং আয়ত্ত করা সুকঠিন ব্যাপার। কোন নাগরিক শিল্পী কিংবা এক অঞ্চলের গান অন্য অঞ্চলের শিল্পীর পক্ষে গাওয়া চলে না। আর জোর করে গাইতে গেলেও তাতে সেই ঢং ও গায়কী আসে না। এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন, 'রেডিওতে গলা শুনলেই বলতে পারি 'গ্রাম্য' গলা না 'শহুরে' গলা। সুরের এই গ্রাম্যতা লোকসঙ্গীতের মুখ্য কথা। কোন গুরুর কাছে বসে তা আয়ত্ত করা যায় না। চাই গ্রাম্যজীবনের সাথে identification। রবীন্দ্রসংগীত, রাগসংগীত গুরুমুখী–শহরের শিক্ষকের কাছে বসে রেওয়াজ করলে আয়ত্ত করা যায়– কিন্তু লোকসঙ্গীত গুরুমুখী নয়। তাকে আয়ত্ত করতে হলে জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য প্রয়োজন। তা থেকে আসে গলায় গ্রাম্যতা। শ্রমজীবী জনতার দুঃখ ও সংগ্রামে একাত্মতা থেকেই আসে সুরের আকুতি ও আর্তি। এই আর্তি আনতে যখন অনেকে কাঁদোকাঁ দো সুরে গান করেন। তখন না হেসে থাকতে পারি না।'

লোকগীতির পরিবেশনায় সুরের আংশিক পরিবর্তন ঘটিয়ে কিংবা আঞ্চলিক গায়কী ঢং ও কণ্ঠভঙ্গির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এনে গ্রাম্যতাও আংশিক পরিহার করে একটু পরিমার্জিত রূপে নাগরিক গায়কদের দিয়ে লোকগীতি পরিবেশনের যে ইঙ্গিত পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন সে বিষয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঘোর আপত্তি জানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। লোকগীতির সুর বিচারের ক্ষেত্রে বিষয়টি একান্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

'শার্ঙ্গদেব অনেক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে যেটুকু অসাবধানী উক্তি করেছেন তার সুযোগ নিয়ে 'গ্রাম্যতা' পরিত্যাগ করে সচেতন urbanisationএর ভেজাল ব্যবসায়ীরা– আঞ্চলিক ভঙ্গিকে (যা তাঁদের কণ্ঠে অসাধ্য) আয়ত্ত করার অপারগতাকে শিল্পের জগতে পরিমার্জনা বলে চালিয়ে নিতে পারেন। এখানে প্রশ্ন, পরিমার্জনা করার অধিকারী কারা? যে রসিকসমাজে পরিবেশনের কথা বলেছেন, সেই রসিক সমাজটিই বা কারা? অলঙ্কারশাস্ত্রে কোন গ্রাম্যতাকে দোষবহ বলেছে– অন্তত লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমি তা জানি না, বুঝতেও পারছি না। শত শত লোকসংগীত গায়ককে 'একেবারে উৎপত্তিস্থলে' দেখেছি যাদের মত গাইতে পারি না বলে আমার আফসোসের অন্ত নেই; গ্রামে গান গাইলেই সবাই গায়ক বলে স্বীকৃত হয় না। সেখানেও রসিকসমাজ আছে– সেখানেও গ্রহণবর্জন আছে। জনসাধারণই এই গ্রহণবর্জনের মালিক। কাজেই যাঁরা গায়েন, বায়েন, ওজা ইত্যাদি বলে গ্রাম্যসমাজে গৃহীত– তাঁরাই সত্যিকারের প্রতিনিধি। এঁদের কণ্ঠে যে গ্রাম্যতা আমি তারই কথা বলছি। এর মধ্যে কোন ম্যানারিজম নেই– বরং ম্যানারিজমটা ঘটে শহরের লোকসঙ্গীত গায়কদের– যা আসে গ্রাম্য ভঙ্গি নকল করার অপচেষ্টা থেকে। জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কলকাতার আধুনিক রসিকসমাজে পরিবেশনের খাতিরে চোখের সামনে কত লোকশিল্পীর অকালমৃত্যু দেখলাম আর অসহায়ভাবে দেখছি লোকসঙ্গীতের উপর নিষ্করুণ অস্ত্রোপচার। শার্ঙ্গদেব যদি ভাবেন আমি নিতান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি, তবে আমি নাচার। গ্রাম্য শিল্পী কিন্তু রক্ষণশীল নয়। একই গান একই অঞ্চলের এক এক শিল্পীকে নিজের স্বকীয় ঢঙে উপস্থিত করতে দেখেছি। সুরের রক্ষণশীলতা ও ভাবের গতিশীলতা হল লোকসঙ্গীতের রূপান্তরের রূপরেখা। কিন্তু সুরের এই রক্ষণশীলতা বলতে অপরিবর্তনীয়তা বোঝায় না। শাস্ত্রীয় সংগীতের উৎপত্তিস্থল যেমন লোকসঙ্গীত, তেমনি শাস্ত্রীয় সংগীতের সর্বভারতীয় রূপটিও লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক রূপকে কখনো কখনো প্রভাবান্বিত করেছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে কোন one way road নেই। গ্রামের শিল্পীর কানেও বিভিন্ন সুর ভেসে আসে। সার্থক শিল্পীর হাতে যখন সমন্বয় ঘটে– তখন জনসাধারণ তা গ্রহণ করে নেয়। একটি গানে ভাটিয়ালির সাথে ভূপালীর সুন্দর সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়– যদিও ঢঙটা পুরো ভাটিয়ালির রয়ে গেছে।

(আমি) কেমনে জানিব গো ও গুরু
কার মনে কি?
আমি যার লাগিয়া আইলাম ভবে
সে দিল ফাঁকি।
কার মনে কি?
আমি দেশবিদেশ ভ্রমণ করি।
মনের মানুষ তালাস করি।
পাই না দেখিতে
আমি সমদুঃখের দুঃখী পেলে গো–
আমি হৈতাম তার সাথী–
কার মনে কি?

এমনি পূর্ববঙ্গের কোন কোন লোকসঙ্গীতে ভীমপলশ্রী, দেশ প্রভৃতি রাগের সুস্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমন্বয়টারও একটা পদ্ধতি আছে– যা জনজীবন বিচ্ছিন্নতায় কোন একক সংগীত প্রতিভার experiment দিয়ে ঘটানো যায় না। কোন কোন সময় সুরে experiment এর অনুপ্রবেশ পলিসঙ্গীতে ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে অতীতে। কিন্তু আজ তা একচেটিয়া কবলিত গণমাধ্যম– বেতার, চলচ্চিত্র, রেকর্ড ইত্যাদি– সহযোগে অত্যন্ত সংগঠিত ও সচেতনভাবে করা হচ্ছে। বাজারের জন্য পণ্যসৃষ্টির মতই এ হল manufactured folk song এবং এর আক্রমণটা আজ আমাদের সামনে ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়েছে।

লোকগীতির ক্ষেত্রে সুর অগ্রগামী। অনেক পণ্ডিত বলেছেন সুর ও কথার গুরুত্ব সমানে সমান। তবে সুর যেখানে কথাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে সেখানেই সুরের উৎকর্ষ। সুর ও তালের বিচারে লোকগীতি সহজ ও সরল। যে গানে তাল জটিলতা মুক্ত সে গানই লোকের মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। লোকগীতির বিশেষ বৈচিত্র্য রয়েছে ছন্দে। অনেক স্থলে ছন্দই শুধু গীতের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন লোকগীতিতে রয়েছে নৃত্য। সুর ও ছন্দেরই অনুষঙ্গ এই নৃত্য, যেমন বাউল ও জারি গানে এমন কি সারি গানেও কখনো কখনো গান ও নাচ অবিভাজ্য রূপ ধারণ করে।

সুরছন্দনৃত্য ছাড়াও লোকগীতির ভাষা ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় বিশেষ ধরনের সুরের খাঁজ, গলা ভাঙার কায়দা ও বিশেষ স্বরে বিশেষ ধরনের সুরের ধাক্কা প্রয়োগ। কণ্ঠস্বরও ভিন্ন হয়। কণ্ঠকে বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ রেখে ভিন্নরূপী গান গাওয়া যায় না। তাই একজন ভাটিয়ালি গায়কের পক্ষে ভাওয়াইয়া গান গাওয়া সহজসাধ্য ও প্রাণবন্ত হয় না। পরিশীলিত সঙ্গীতে গুরুমুখী শিক্ষার দ্বারা দক্ষতা অর্জন করা যায়, কিন্তু লোকগীতির ক্ষেত্রে গায়কী ছাড়া আঞ্চলিক ভাবানুষঙ্গ বা বিশেষ ঢং ও উচ্চারণ রপ্ত করা কঠিন। অর্থাৎ লোকগীতি কোন প্রথাগত সঙ্গীত চর্চা নয়; এতে লোকসাধারণের প্রাণের আকুতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। তাই নির্দিষ্ট কোন ছকে লোকগীতি গাওয়া নাও হতে পারে। গায়কের মেজাজ, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও পরিবেশের উপর লোকসঙ্গীতের গায়নরীতি অনেকটা নির্ভর করে। হয়তো অনেকটা নয়, natural settingএর উপরই একটি লোকসঙ্গীতের সত্যিকারের লোকগীতি হয়ে ওঠা পুরোটাই নির্ভর করে।

প্রশ্ন জাগে বাঙলা লোকগীতির যে বৈচিত্র্য সুরছন্দতাল এর ঐতিহাসিক ও সামাজিক সূত্রটা কি? অনেক পণ্ডিতই বলতে চান যে, বাঙলা লোকগীতি চারপাঁচ স্বর জড়িয়ে ছয়সাত স্বরেও কখনো কখনো গীত হয়। পরিশীলিত সঙ্গীত বা রাগসঙ্গীতের সঙ্গে যে এর মেলবন্ধন রয়েছে সে কথায় আমরা সবাই কমবেশি ওয়াকিবহাল। রাগসঙ্গীতের গঠনশৈলীতে লোকগীতির উপাদান রয়েছে সেও আমরা জানি। পরিশীলিত সঙ্গীত বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে– বহমান দুই সঙ্গীত ধারা একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। সে ক্ষেত্রে একথা বলতেই হয় যে পরিশীলিত সংগীত লৌকিক ধারাটির উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে; এবং লোকগীতিও পরিশীলিত সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে চলেছে– এই লেনদেনের পালা নিরন্তর। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী লিখেছেন:

'বাংলা লোকগীতিতে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান। এই ভাটিয়ালি সুরে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তা রাগসংগীতের খাম্বাজ ও পিলু সুরের সমগোত্রীয়। কখনো কখনো ভীমপলশ্রী, পটদীপ রাগের সঙ্গেও এর মিল লক্ষ্য করা যায়, ঠাট প্রকরণ বিচার করলে খাম্বাজ এবং কাফি এই দুইটি ঠাটের সঙ্গে ভাটিয়ালির নিকট সম্বন্ধ। ঝুমুরের সুরভঙ্গির মধ্যেও খাম্বাজ তথা পিলুর আমেজ পাওয়া যায়। বাউলের মধ্যে আছে বেহাগ, খাম্বাজ, ভৈরবী, বিলাবল প্রভৃতি রাগরাগিণীর প্রভাব। গুজরাটে 'মাঢ়' বলে লোকগীতির একটি শ্রেণি আছে আবার দেখা যায়, 'মাঢ়' বলে একটি রাগও আছে। পাহাড়ী বলেও একটি খেয়ালঠুংরীতে সচরাচর গেয় রাগরাগিণী আছে। এর সঙ্গে লোকগীতির সুরভঙ্গির অদ্ভুত আত্মীয়তা লক্ষণীয়। তেমনি 'ধানী' ও 'ধানেশ্রী' এ দু'টিও লোকগীতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে সম্বন্ধযুক্ত। বিহারউড়িষ্যা অঞ্চলে 'বিহার' নামে এক ধরনের লোকগীতির সুর প্রচলিত আছে যা স্পষ্টতই তিলক কামোদ, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগের সংস্কার বলে স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ, খাম্বাজ আর কাফি ঠাটের রাগরাগিণীর স ঙ্গেই লোকগীতির সুরের বেশি ঐক্য দৃষ্টিগোচর হয়।'

কিন্তু বাংলার লোকগীতি শুধু রাগরাগিণীর স ঙ্গে যুক্ত আছে বলেই যে তার সুরবৈচিত্র্য আছে এমন নয়। বাংলা লোকগীতি কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপ ভঙ্গিতে নয়, সাত স্বরের ঐশ্বর্য নিয়েও অন্যান্য দেশের

লোকগীতি থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল সুরের দিক দিয়েই নয়, ছন্দের দিক দিয়েও এর মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। এর প্রেক্ষাপটে পরিশীলিত সঙ্গীতের কিছুটা চেতনা জাগ্রত রয়েছে বলেই সুরে ও তালে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বাঙলা লোকগীতিতে যেমন সহজ সরল ছন্দের ব্যবহার, যথা– ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক তাল লক্ষ্য করা যায় তেমনি রাগসংগীতের ধ্রুপদ অঙ্গের তালের ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন বিষমপদী ছন্দের তাল তেওরা, ঝাঁপতাল।

গ্রামবাংলার পলি সমাজে পলির স্বভাবকবির বাঁধা প্রচলিত সহজ-সরল পদ ও সুরের গানই বাংলার লোকগীতি। অপরূপ বৈচিত্র্যময় সুর, সুললিত ভাষা, সংহত ভাবের অভিব্যক্তিতে এবং প্রাণবন্ত ছন্দে সমৃদ্ধ বাংলার এই লোকগীতির সুদীর্ঘকালের একটা প্রবহমানঐতিহ্যময় ধারা আছে। একথা আমাদের অজানা নয়, আর্যস ঙ্গীত বা মার্গসঙ্গীত শুধু ঋত্বিকগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মূলত তার কাঠিন্যের জন্য। সাধারণ মানুষ যেহেতু লৌকিক গীতির মধ্য দিয়েই তাদের মানবিক অনুভূতিগুলির প্রকাশ করতেন সেহেতু ঐ ধারার গীতির সঙ্গে পরবর্তীকালের বিভিন্ন যুগের নানা বৈচিত্র্যের লোকগীতিসমূহ উপরোক্ত যুগের লৌকিক গীতিধারারই একটি সার্বিক ও সমন্বিত রূপ যা তার প্রারম্ভিক যুগের কালগত সময় থেকে কয়েক সহস্র বছরের বিবর্তনের পথ পরিক্রমণ করে ধারণ করেছে তার বিভিন্ন শৈলীগত সুষমা এবং সৌন্দর্য। লোকগীতির বিবর্তন সম্পর্কিত উপর্যুক্ত ধারণা সর্বমান্য না হলেও একেবারে অগ্রাহ্যও হয়নি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, বিভিন্ন যুগে সঙ্গীতের বিভিন্ন বিবর্তন ও রূপগত অবস্থা সে সম্পর্কে সঠিকভাবে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এর কারণ হল, পরিশীলিত সঙ্গীতের একটা মর্যাদা বিদ্বৎসমা জে বা পরবর্তীকালে বিত্তবানসমা জে সব সময়ই ছিল (আজও আছে) তাই ঐ সঙ্গীত-চিরদিনই একটা দরবারি সম্মান পেয়ে এসেছে। অপরদিকে, লোকগীতি-শিল্পী গ্রামীণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ বলে এবং তার শিল্পকর্ম নিম্নমানের শিল্প ধারণা করেই, ঐ শিল্পী ও তাঁর শিল্প কোনদিন জাতে ওঠেনি এবং রাজদরবা রেও স্থান পায়নি। তাই সেই শিল্প ও শিল্পীদের নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায়নি এবং স্বভাবতই সেই শিল্পসং স্কৃতি নিয়ে রচিত হয়নি কোন ধারাবাহিক ইতিহাস। তবে, সেই লোকগীতির যে একটা প্রবহমান ধারা ছিল সেকথা পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীগণ স্বীকার করেছেন। সে ধারা স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত ছিল। আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লোকগীতির যে রূপরসগত পরিণতি দেখা যায়, এর ইতিহাস প্রায় হাজার বছর। বাংলার লোকগীতি সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

লোকগীতিতে আছে সহজ প্রাণের আনন্দ ও জীবনের অনুভূতি। প্রকাশের সামগ্রিক সারল্যই লোকগীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সহজ ভাষা, ভাবসু রের একাত্মতায় মানবিক স্বচ্ছ ও সুন্দর আবেদনপূর্ণ লোকগীতি তার আত্মিক অনুভূতি নিয়ে সব দেশেই সাধারণ মানুষের মনের দরজায় পৌঁছতে পেরেছে। সারল্যের মাঝেও লোকগীতিতে মাঝে মাঝে বিধৃত হয় লোককবির গভীর জীবনবোধ এবং গভীর আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি, যে কাব্যিক ভাব সুরের স্বতঃস্ফূর্ত এবং অভিনব ব্যঞ্জনায় মিলেমি শে উজ্জ্বলভাবে মূর্ত করে কখনো মানবিক যন্ত্রণাব ঞ্চনা ও শোষণের চিত্র, কখনো ভাষায় প্রকাশ করে আন্তরিকভাবে নারী ও পুরুষের চিরন্তন ভালবাসাকে।

আদিম যুগে মানুষের শ্রম ছিল যৌথ প্রক্রিয়াজাত। জীবনের অনিবার্যতা থেকে যৌথ শ্রমের উৎপত্তি ঘটে। দেহ সঞ্চালন থেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে উৎপত্তি ঘটে ছন্দ ও তালের। মানবিক শ্রমের সুবিন্যস্ত প্রয়োগে নানা গতি ও ছন্দের বিকাশ ঘটে। শ্রমের সহযোগী অঙ্গ সঞ্চালনমূলক কর্মসং স্কৃতিই পরিণতিতে নাচ এবং গানে প্রতিফলিত হয়। প্রাকৃতিক উপাদানকে রূপান্তর করা হয় শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। উৎপাদনের হাতিয়ারের সঙ্গেই মানুষ ব্যবহার করে নিজেদের দেহ, দেহাঙ্গ ও বলকে। হাতিয়ারের সাহায্যে হাত-চোখ মস্তিষ্কের যৌথ পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদনের জন্যে শ্রম। শ্রমে উদ্দীপনা সৃষ্টির সূত্রে এবং শ্রমকে আনন্দদায়ক ও খাটুনীজনিত ক্লান্তি অবসাদকে ভুলে থাকার সূত্রে স্বতঃসিদ্ধভাবেই উৎপত্তি ঘটে গান ও নাচের। আমরা তো জানি যে, ইউরোপে প্রাচীন যুগে অভিজাতদের কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণা ছিল। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সন্তদের অন্তত একাংশের কাছে শ্রম শ্রদ্ধাযোগ্য মর্যাদাশীল বলে বিবেচিত হয়েছিল। ভারতের কতিপয় সাধক যে আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু কঠোর শ্রমের ব্যাপার ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে আশ্রম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন ও জীবনযাপনের কেন্দ্র। রাষ্ট্রের অধিকারের বাইরে মানুষ এখানে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সুশৃঙ্খলভাবে উৎপাদন করত। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় শিল্পসং স্কৃতিদর্শ নের মহত্তম সৃষ্টিতে নিরত থাকত। আমরা একথা তো জানি যে কবীর, নানক, রবিদাস, তুকারাম, দাদু, লালন প্রমুখ সাধক কোন না কোন কায়িক শ্রমে যুক্ত ছিলেন। নাথ সাধকদের অনেকে বস্ত্র বয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লালন শাহের গুরু বলে খ্যাত সিরাজ সাঁই পাল্কি বাহক ছিলেন। মুর্শিদাবাদে চাষীদের প্রবাদে বলা হয়, 'মাঠতো রূঢ়, দেহ গড়, চষ মাটি তারপর'। ভাববাদীদের কাছে কাজ সাধনার ব্যাঘাত ঘটায়। শ্রমজীবীদের দৃষ্টিতে শ্রমে মন নিবিষ্ট থাকায় শ্রমেই সাধনা। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে কাজ করতে হবে সবাইকে, কেউ কাজ করবে না এমন ভাবাই যাবে না। গীতায় কোন প্রকার ফলের আশা না করেই কাজে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাংলার মাতুয়া মতাদর্শের গুরু হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বলেছেন, 'মুখে নাম, হাতে কাম'। উচ্চবিত্তের দেহরক্ষায় শ্রমের ভূমিকা নির্দেশ করে গুরুসদয় দত্ত গান বেঁধেছিলেন যে কোদাল চালালে, 'হবে শরীর ঝালাই। যত ব্যাধি বালাই। বলবে পালাই পালাই।' তিনি শ্রমের আনুষঙ্গিক নৃত্যগীত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, এগুলির মধ্যে 'ভূমি আত্মার ছন্দ ও ভাষা সংরক্ষিত আছে'।

আমরা ট্রাইবাল সমাজের যূথবদ্ধ জীবনের কথা উলেখ করেছি। প্রাচীনকালে কিন্তু একমাত্র শারীরিকভাবে অক্ষম এবং শিশু ছাড়া সবার জন্য শ্রম ছিল জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। আর সেই যৌথশ্রমে ছিল এক ধরনের আনন্দ। তারা সবাই ধরে নিয়েছিল এটা তাদের করতেই হবে– কর্ম যেন তাদের জীবনসাথী– ধ্যানমগ্ন হয়ে গাছের আবডালে বসে থাকলে চলবে না। আমরা জানি যৌথ শ্রমপ্র ক্রিয়া থেকেই ছন্দ ও সুরের উৎপত্তি। আজও নৌকাবাইচ, ছাদ পেটা, পাইলিং করা ইত্যাদিতে তার সাড়া মেলে। আমাদের গানেও এর ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। এমনকি আধুনিক অনেক কবিসাহিতি্যক ও গীতিকার শ্রমসংক্রান্ত গানকে সমাজচেতনার অনুষঙ্গ হিসেবে রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন এবং কণ্ঠ দিয়েছেন। জানা যায় বাংলার ঝুমুর গান আদিতে ছিল কৃষিভূমির শ্রম গান। করম, ভাদু, টুসু প্রভৃতিও কৃষিসংক্রান্ত শ্রমগানের বিবর্তিত রূপ। অশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রমগান সংগ্রহ এবং আলোচনা করেছেন গুরুসদয় দত্ত। কৃষির গান 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' রবীন্দ্রনাথ *রক্তকরবী* নাটকে ব্যবহার করেছেন। ধান কাটার গান 'ও যখন বসে ধান কাটি, মনে ভাসে তার লয়ান দু'টি' দীনবন্ধু মিত্র তার *নীলদর্পণ* নাটকে ব্যবহার করেছেন। পাল্কির গান এবং সারিগানের তালকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার কবিতার ছন্দে অনন্য করে তুলেছেন। ছাদ পেটানোর তালে গান রচনা করেছেন কবি নজরুল ইসলাম। সুকান্তের *রানার* কবিতায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গীতরূপে শ্রমসঙ্গীতের উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে। ভূপেন হাজারিকার *দোলা* গানটিও শ্রমসঙ্গীতের অনন্যতা পেয়েছে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা শ্রমসঙ্গীতের ঐতিহ্যকে ম্লান করতে চাইলেও সে বিকল্প পদ্ধতিতে বিকশিত হচ্ছে। ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, পাইলিং ইত্যাদি কাজের অনুষঙ্গে শ্রমিক কবি গান রচনা করছেন এবং তা তারা গেয়ে ফিরছেন। সারা বিশ্বে শ্রমসঙ্গীতকে আরাধ্য করে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিবাদী শিল্পী গোষ্ঠী। তারা শ্রমজীবী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে আজও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন সুর।

যৌথজীবনের অনুষঙ্গে সৃষ্ট লোকগীতির সঙ্গে নৃত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে ছিল। আজও বহু লোকগীতি নৃত্যসংবলিত। আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় তারা গান গাওয়ার সময় না নেচে পারে না। আবার নাচের সময়ও গান না গেয়ে পারে না। এই নাচ এবং গান আর গান আর নাচ এটা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। গ্রামীণ জীবনেও অধিকাংশ সময়ই লোকগীতির সঙ্গে দেহ সঞ্চালন দেখা যায়। লোকগীতির ক্ষেত্রে কথায় থাকে এক

প্রকার সরল ছন্দ। কথাতাললয়ছ ন্দই তার সুরের যোগানদার। সুর লোকগীতিকে দিয়েছে অনন্য বৈভব। লোকগীতি পরিচয়ের চিরন্তন বাহন তার সুর।

বাউল সুর, বাউলের জীবনদর্শন ও বাউল গান বাংলার অনেক কৃতি পুরুষকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের কথায়, ভাবে ও সুরে যে কতটা আপুত, আকৃষ্ট ও প্রাণিত হয়েছিলেন তা তাঁর নিজের লেখায় অনেকভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রাণধর্মের প্রেরণা আর বাউলের প্রেরণার উৎস ছিল এক ও অভিন্ন। তাই বাউলের মনের মানুষ তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার একটি ঐক্য ও সাযুজ্যবোধ সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব। বাউল গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদী জীবনচেতনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, বিশ্ব দেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচ ন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষ করে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছেন 'মনের মানুষ'। 'রবীন্দ্রনাথ *ছোটো বড়ো* ও *আত্মবোধ* নামক প্রবন্ধদ্বয়ে বাউলের 'মনের মানুষ তত্ত্বে'র এক বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

ছোটো বড়ো

... বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম;
আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
সে আরো গেয়েছিল :
আমার মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে।
তার গানের এই কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।... মানুষ আপনার সবকিছুর ম ধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেইজন্য ঐ বাউলের দলই বলছে...
খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।
আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা!–
আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকটর ূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ। তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে:
আমার মনের মানুষ কে রে!
আমি কোথায় পাব তারে!

সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারবো না– তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। 'কোথায় পাবো তারে?' কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে পাওয়া যাবে না– স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া– আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে– এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে; যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে, 'আমি কোথায় পাব তারে?' সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে নাপাওয়া। সেই পাওয়া না পাওয়ার নিত্য টানই মানুষের নব নব ঐশ্বর্যলাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসারএক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত 'আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই-যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ তো কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না। জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে; ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে যে তাকেই মানুষ বলেছে 'আমি চিরকালের মতো পৌঁছেছি–আমি পেয়ে বসে আছি'– এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে; সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই যে তার চিরকালের গান:
আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন
মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে!
কেননা, স ন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।'

আত্মবোধ

কয়েকদিন হলো পলিগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কি আমায় বলতে পার?' একজন বললে, 'বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না'। আরএকজন বল লে, 'বলা যায় বই কি– কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে, সবাইকে শোনাও না কেন?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ কি আসছে?' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পলিগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল এ তো মিথ্যে বলেনি। আসছে, সমস্ত মানুষ আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে– আর যাবে কোথায়? ...

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কি সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলাদেশের পলিগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে– আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই।...

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই আপনির খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তহাস্যে বলছে সবাইকেই আসতে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেননা, এতো কোনো বিশেষ মতের, বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক।...

...হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষায় এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায়– এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায়নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয়নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারিগান:
মন মাঝি, তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতার ভাষ্যেও বাউলচেতনার সাথে একাত্মতার পরিচয় ঘোষণা করেছেন:

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।
(পঁচিশে বৈশাখ, *শেষ সপ্তক*)

বাউল গানের সুর, তার বাণী ও বাউল গানের দর্শন ক্রমশ তাঁকে রবীন্দ্রবাউলে পরিণত করেছে। এক পত্রে তিনি লিখেছেন 'বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে।' অন্যত্র শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপচারিতায় পাই: '...তুমি তো দেখেছ, শিলাইদহ হতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরিব। পোষাক পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত।'

জমিদারি পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউল গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। এই শিলাইদহেই চলমান বাউল জীবনের মরমি অন্বেষণকে তিনি অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে, চিত্রিত করেছেন তাকে কবিতায়:

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারাহা তে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে। (পত্রপুট)

আমাদের দেশের লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষী লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুসন্ধানের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন গ্রামীণ মেহনতি মানুষের নবজাগরণ থেকে। সিপাহী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, পাগলপন্থী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে এ যুগের প্রথম পাদ হতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন– সেই অনুপ্রেরণার পটভূমি রচনা করেছিল।

এটা খুবই লক্ষ্যণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক গানের অধিকাংশেই লোকগীতির সুর কেবল নয়, বাচনভঙ্গিও ব্যবহার করেছিলেন। এর আগে বিভিন্ন কৃষিবিদ্রোহের ও আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় লোককবিরা তাদের নিজস্ব সুরে গান ও ছড়া লিখেছেন গণমনের প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু নাগরিক সাঙ্গীতিকজ্ঞান ও বৈদগ্ধ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম অত্যন্ত সচেতনভাবে লোকগীতির খাঁটি সুর আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। এর পেছনেও কাজ করেছিল বিরাট গণজাগরণ। ত্রিশোত্তর বাংলায় আব্বাসউদ্দীন, শচীনদেববর্মণ এবং অন্যান্য অখ্যাত গ্রামীণ গায়কের জনপ্রিয়তা, তাদের রেকর্ডের অভূতপূর্ব চাহিদা প্রথম যুদ্ধোত্তর ভারতে গণজাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে।

'সংগীতের মুক্তি' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

'...আমাদের সংগীতও রাজসভা সম্রাটসভায় পোষ্যপুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল, সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সংগীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য সংগীত, বাউলের গান, এসবের মার নাই। কেননা, ইহারা যের সে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিল্পও টিকিতে পারে না।

...একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এরাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙ্গাক সে কিসের কেয়ার করে। এই সুরগুলি কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না– স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।'

লালনের মানসভুবন গ ড়ে ওঠে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ থেকে নবদ্বীপের ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী নদীয়ার সামাজিক মানুষের দুঃখ, বেদনা, আনন্দউ চ্ছ্বাস এবং প্রবহমান নদীমাতার উদাস করা একতারার সুরের ভুবন থেকে। পদ্মা, যমুনা, গড়াই, বড়াল, আত্রাই, ধলেশ্বরি, নাগর, ইছামতি, গোমতি, হুরাসাগর, করতোয়া এসব নদীর প্রবহমানতা ও তার দুই পার্শ্বের মানুষ রবীন্দ্রনাথকেও ভাবাবেগে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমে, মানবপ্রেমে উচ্ছ্বসিত করেছিল। বাঙালির গর্ব এইখানে যে পতিসর, শিলাইদহ, শাহজাদপুরে জমিদারি দেখার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ এক দশক (১৮৯১৯৯ ০১) এই নদী এবং জনপদে অবস্থান করেছিলেন। তিনি লিখেছেন... 'আরকি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গড়াই নদীর উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে পড়ে থাকতে পারব? হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়ে বা জন্মাব? এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আশ্চর্য এই আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।' (*ছিন্নপত্রাবলী*, ৯৮ নং চিঠি)

কবির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল পদ্মা। তিনি দেখেছিলেন পদ্মার ভয়ঙ্কর রূপ ও উদাসমূর্তি। *ছিন্নপত্রাবলি* মূলত পদ্মার জীবনচিত্র। কবি বিশেষভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন পদ্মার বিপুল জলরাশির নিরন্তর প্রবহমানতায়। পদ্মা তার জীবন ভাবনায়ও এনেছিল নিরন্তর প্রবহমানতা।

বাউল গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ কোন সময়ে কিভাবে জন্মায় তার সঠিক হদিস না মিললেও অনুমান করা চলে শিলাইদহের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রেই হয়তো তা হয়েছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে তিনি শিলাইদহে আগমন করেন। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে এসে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক রচিত হয়। লোকসংস্কৃতির উদার বিস্তৃত ক্ষেত্র তার শিল্পীমানসকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বিশেষ করে বাউলের একতারা ও গান রবীন্দ্রচিন্তা ও মননে এক বিশ্বমাতৃক ও মানবপ্রেমিক অনুভব সূচিত করে। সে সময় কুষ্টিয়ার এই জনপদ কাঙাল হরিনাথ, গগন হরকরা এবং ফকির লালনের একতারার অন্তর পলব্বিত করা সুরে মুখরিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথিবী যে কি আশ্বর্য সুন্দর এবং কি প্রশস্তমান এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এখানে না এলে মনে পড়ে না'।

লালনের গান রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। বলতে গেলে লালন ও গগন হরকরার গানকেই তিনি বাউল গানের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়?' গানটি ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাব জগতের পরিচালিকা শক্তি। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'লালনের এই পদটি কবিচিত্তে দীক্ষাবীজ বপন করেছিল। বাউলের গানের সুর ও বাণী, তত্ত্ব ও শিল্প রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রাণিত করেছিল। লালন বলেন:

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনমভর একদিন দেখলাম নারে ॥

রবীন্দ্রনাথের একই ভাব, ভাষাও একই :

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে বাউল প্রভাব তথা লালন প্রভাব লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান কবি, বিশ্বজনীন মানবতার পতাকাবাহী কবি, তিনি ছিলেন সর্বকালের শুদ্ধতম সুস্থতম এক শিল্পী-মানুষ। লালন বাউলের সুর ও বাণীকে ভেঙে নব-বাউলের উদ্ভাবন তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব। তিনি করেছেনও তাই, যা একান্তত্বই রবীন্দ্র-বাউলের রচনা। রবীন্দ্রনাথের মরমি-মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস।

তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহিরপা নে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়প্রাণে চাইনি।
এই আত্মঅ ন্বেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সকল পরিচয়ের কথা। লালন বলেন
যার আপন খবর আপনার হয় না।
আপনারে আপনি চিনতে পারলে
যাবে সেই অচেনারে চেনা।
রবীন্দ্রনাথ পরিশীলিত করে বলেন:
আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানার সঙ্গে তোমায় চেনা।
রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে বাউল প্রভাব তথা লালন প্রভাব লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান কবি, বিশ্বজনীন মানবতার পতাকাবাহী কবি, তিনি ছিলেন সর্বকালের শুদ্ধতম সুস্থতম এক শিল্পীমানুষ। লালন বাউ লের সুর ও বাণীকে ভেঙে নববাউ লের উদ্ভাবন তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব। তিনি করেছেনও তাই, যা একান্তত্বই রবীন্দ্রবাউ লের রচনা। রবীন্দ্রনাথের মরমিমান সে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস। কালজয়ী এই দুই গীতিপ্রতিভা সম্পর্কে এ কথা হয়তো বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষর পলিবাসী হলে লালন ফকিরের মতো মরমি কবি হতেন, আর লালন সাঁই শিক্ষিত হলে হতেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিদ্বান কবি।

'মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাউলসংগীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদ লের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপআ লোচনা হতো। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, –শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল:
কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তং বেদ্যং পুরুষ বে মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ– যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়, যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের না জানবার বেদনা– অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতর সদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।'

বাউল সুরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। শিলাইদহ পোস্ট অফিসের ডাক হরকরা লোককবি গগন হরকরার প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের উপর যথেষ্ট পড়েছিল। গগনের পুরো নাম গগনচন্দ্র দাস, জন্ম শিলাইদহেরই নিকটবর্তী আড়পাড়া গ্রামে। গগন হরকরা লালন শাহের সামান্য কনিষ্ঠ। বাউলগান রচয়িতা ও সুগায়ক হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। সেই সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। গগনের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচ য়ের পূর্বেই তিনি ভিন্ন গায়কের কণ্ঠে তাঁর রচিত গান শুনে তাতে উচ্চভাবসম্পদের আভাস পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। এই গগনের নিকট থেকেই তিনি বিভিন্ন সাধকের বাউল গান শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। লালনের পর গগনের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'র মতই রবীন্দ্রবাউলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথসংগৃহীত গগন হরকরার এই বিখ্যাত গানটি দিয়েই *প্রবাসী* পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগের (বৈশাখ ১৩২২) সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-অভিভাষণপ্রবন্ধে গগনের গানের উলেখ করেছেন। হিবার্ট লেকচার, কমলা বক্তৃতা, *হারামণির* ভূমিকা, 'An Indian Folk Religion' নামীয় বক্তৃতায় তিনি রসজ্ঞ বোদ্ধার মত গগনের গান উদ্ধৃত করে তার তত্ত্বব ্যাখ্যা করেছেন।

শিলাইদহে কবির অবসর সময়ে গগন হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রায় নিত্যসহচর। প্রিয়ভাজন গগনের গানের বিশেষ অনুরক্ত রবীন্দ্রনাথ। জানা যায়:
'ইনি [গগন] ছিলেন শিলাইদহ পোষ্টাপিসের পিয়ন। তাই 'গগন হরকরা' নামেই ইনি বেশি পরিচিত ছিলেন। পোষ্টাপিসের চিঠি বিলির কাজে গাঁয়ে গাঁয়ে একে ঘুরতে হত। সে সময় মাঠের মধ্যে, নদীতীরে ইনি প্রাণের আনন্দে মরমী সংগীত গেয়ে শান্ত প্রকৃতিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিতেন, পলির কুটীরে কুটীরে রসতরঙ্গ জেগে উঠত। চিঠি বিলি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় প্রত্যহই এঁকে যেতে হত, সেখানে চলত রসালাপ,–গানের পর গান, সুরতরঙ্গ। অনেকদিন সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ এঁর গীতসুধা পান করতেন।

গগন ছিলেন প্রাণখোলা উদ্দাম ক্ষ্যাপা প্রকৃতির মানুষ। তিনি তাঁর মরমি অন্তরের নির্দেশ ও প্রেরণায় নেচে নেচে গান গেয়ে চিঠি বিলি করে বেড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ গগন বাউলের এই মুক্তনৃত্যকে তাঁর কোন কোন নাটকের বাউল চরিত্রে আরোপিত করেছেন। রবীন্দ্রনাট কে বাউল চরিত্র ও বাউলনৃত্য সংযোজনের ক্ষেত্রে গগনের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর* নাটকেও আছে গগন-চরিত্রের ছাপ।

রবীন্দ্র মানসে বাউল চেতনা সঞ্চারের মূলে রয়েছেন লালন ও গগন হরকরা। বাউলতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর ধারণা গঠনে গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। সংগীত রচনার প্রেরণা হিসেবেও গগনের গান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে' এই গানটির প্রেরণায় ও অবিকল অনুকৃত সুরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর স্বদেশীযুগের প্রাতিস্বিক গান, যা বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় অভিষিক্ত, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

ড. আবদুল ওয়াহাব প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

নজরুল সংগীতে লোকজ সুর

সন্তোষ ঢালী

বাংলার নানা সঙ্গীতের মধ্যে সবচেয়ে উলেখযোগ্য এবং সমৃদ্ধ ধারা তার লোকসঙ্গীত। এদেশের মাটি-জল-হাওয়া-হাওর-বাওর-বিল-নদী-মাঠ-কৃষি সব মিলিয়ে এ ভূখণ্ড লোকসংগীতের উর্বরা ভূমি। বিখ্যাত লোকতত্ত্ববিদ মযহারুল ইসলাম মনে করেন, 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান যদি ভারতীয় উপমহাদেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, বাংলা লোকসাহিত্য এবং বিশেষভাবে বাংলা লোকসঙ্গীত সম্পর্কে একথাটি অধিক প্রযোজ্য।... বাঙালীর লোকসঙ্গীতে সুরের ভাবের বিষয়ের এবং ব্যঞ্জনার যে বৈচিত্র্য আছে, উপমহাদেশের আর কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে তেমনটি আছে বলে আমার জানা নেই।' সুর গানের একটা প্রধান অঙ্গ। বাংলা গান বাণীপ্রধান হলেও সুরের আলাদা মহিমা রয়েছে। কথার চেয়ে সুরই বেশি আকৃষ্ট করে মানুষের মনকে। নিভৃত মনের গোপন রসটুকু ধরা থাকে সুরের আধারেই। তাই সুরের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন সুরের একটা সার্বজনীন আবেদন থাকে। সুরের মধ্যে এমন এক যাদু থাকে যা হৃদয়কে আর্দ্র করে কিংবা নাড়া দেয়। মনকে বিগলিত বিচলিত করে। সুর স্বর বা শ্রুতির সুসমন্বিত বিন্যাস। শ্রুতির এই বিন্যাসের ফলেই মানবমনে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত আলোড়ন, সুমধুর ক্রিয়া। প্রত্যেক জাতি বা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে কোন কোন সুর থাকে আবহমানকাল ধরে প্রচলিত। সে-সব সুর তাঁদের জীবনে ও অন্তরে সুদৃঢ় আসন করে নেয়। লোকমানুষের সৃষ্ট এসব সুরে লোকমানসের প্রভাব থাকে। তার থাকে নিজস্ব একটা ঢং বা চলন। অঞ্চলভেদে তা হয় ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

জীবন, জীবিকা, পেশা, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, প্রকৃতি, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাব থাকে সুরে। কিংবা অবস্থানগত কারণে সৃষ্টি হয় কোন সুর। বা সুরের তারতম্য ঘটে। সুরের এই শিল্পতত্ত্ব বড় সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। তবে বলা যায়, প্রত্যেক দেশ বা সমাজেই মাটি থেকে উৎসারিত সুরই লোকসুর। শ্রমজীবী মানুষ জীবনঘনিষ্ঠ ও মৃত্তিকাসংলগ্ন যে সুর সৃষ্টি করে থাকে

নজরুলের গানের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে লোকসঙ্গীত। এতে লোকজ সুরের প্রয়োগতো রয়েইছে; অন্যান্য যে সব গান রয়েছে তাতেও লোকজ সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের লোকসঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীতে যে লোকজ সুর ব্যবহার করা হয়েছে, তা-ই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বাংলা গানে যে লোকসুরগুলো প্রচলিত আছে তার মধ্যে অন্যতম বাউল, রামপ্রসাদী, ভজন, কীর্তন, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পুঁথিপাঠ, সাঁওতালি, গম্ভীরা, ধামাইল, ইসলামি ইত্যাদি গানের সুর।

অবচেতনভাবে মনের গভীর কোন উপলব্ধিতে তাই লোকসুর। ব্যষ্টিক বা সামষ্টিকভাবে সৃষ্ট কিংবা এককভাবে সৃষ্ট সুরই সামষ্টিকতা লাভ করে, এমন সুরই লোকসুর বলে গণ্য হতে পারে। সব সমাজেই লোকসমাজ স্বীকৃত দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সুরগুলোই লোকসুর বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক সুরস্রষ্টারই থাকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। আর তা তৈরি করতে হয় কঠোর শ্রম আর মেধা দিয়ে, সাধনা দিয়ে। মেধাবী সুরস্রষ্টা লোকজীবনের আঙিনায় ছড়িয়ে থাকা সুরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যথাযথ স্থানে পরিবেশন করেন। লোকসমাজে আবহমানকাল ধরে প্রচলিত লোকমানুষসৃষ্ট সুরগুলোই লোকজ সুর। তার থাকে এক চিরন্তন আবেদন। কথা আর সুরের সার্থক সম্মিলন ঘটান যোগ্য সুরকার। অবিভক্ত বাংলায় যেসব লোকসংগীত প্রচলিত ছিল বা রয়েছে তাতে লোকসুরের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে যার মানবিক আবেদন কখনওই ফুরায় না। সে সকল সুর পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিতভাবে বিভিন্ন সুরস্রষ্টা তাঁদের গানে ব্যবহার করে থাকেন। নজরুলও করেছেন তাঁর গানে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই পালনীয় কিছু আচারপ্রথা রয়েছে যার সঙ্গে গান বা সুরের সম্পর্ক আছে নিবিড়ভাবে। নজরুল সেখান থেকেও গ্রহণ করেছেন নানারকম ভাব ও লৌকিক সুর। এ বিষয়ে আবদুল কাদির বলেন 'প্যানইসলামত্ব বা লৌকিক হিন্দুত্বের জন্য আসলে নজরুলের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। সেই লোকপ্রিয় ভাবসমূহের আশ্রয়ে তিনি নব নব সুরের সাধনা করিয়াছেন মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, গানের কথাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার কোন গভীর স্বপ্ন বা সহৃদয়তা নাই। গানকে সহজে জনপ্রিয় করার উপচেতন আগ্রহেই তিনি প্রচলিত মতাদর্শকে আমল দিয়া থাকেন।' লোকসুরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে লোকমানুষ, লোকজীবন ও লোকসমাজের– এক কথায় ঐতিহ্যের। নজরুল ঐতিহ্য সচেতন বলেই তাঁর গানের একটা বিশাল অংশ জুড়ে লোকজ সুরের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

নজরুলের গানের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে লোকসঙ্গীত। এতে লোকজ সুরের প্রয়োগতো রয়েইছে; অন্যান্য যে সব গান রয়েছে তাতেও লোকজ সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের লোকসঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীতে যে লোকজ সুর ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বাংলা গানে যে লোকসুরগুলো প্রচলিত আছে তার মধ্যে অন্যতম বাউল, রামপ্রসাদী, ভজন, কীর্তন, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পুঁথিপাঠ, সাঁওতালি, গম্ভীরা, ধামাইল, ইসলামি ইত্যাদি গানের সুর। এ সুরগুলো লোকমানুষ সৃষ্ট, একান্তই হৃদয়উৎসারিত। লোকজ এসব সুর নজরুল তাঁর বিভিন্ন গানে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই গানগুলোতে বাংলার চিরায়ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে। শাশ্বত বাঙালির হৃদস্পন্দন ধরা পড়েছে। বিভিন্ন লোকজ সুরে সৃষ্ট গানের সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল–

বাউল

বাউল গান বাংলা গানের এক উজ্জ্বল ধারা। নজরুলের বেশ কিছু গানে বাউল দর্শন ও বাউল গানের সুরের প্রভাব রয়েছে। এ সব গানে সুন্দরভাবে মরমি ভাবধারার প্রকাশ ঘটেছে। বাউল গানের সুরের মধ্যে এক শান্ত সমাহিত ভাব রয়েছে। বাউল গানের সুরে নজরুল বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। ১. আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল/ আমারি এই আপন দেহ, ২. আকাশের আর্শিতে ভাই/ পইড়াছে মোর মনের ছায়া। ৩. কাণ্ডারী গো, কর কর পার/ এই অকূল ভবপারাবার। এ গান গুলোতে বাউল গানের সুর ব্যবহৃত হয়েছে।

রামপ্রসাদী

রামপ্রসাদী গানের সুরে একটা আলাদা ঢং রয়েছে, যা একান্ত নিজস্ব। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ করে শ্যামা মাকে নিয়ে রচিত এসব গানে আত্মনিবেদনের আর্তি রয়েছে। সাধক রামপ্রসাদ সেন এ গানের রচয়িতা এবং সুরস্রষ্টা। এ গানের আদলে নজরুল বেশ কিছু উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। ১. তুই লুকাবি কোথায় মা কালী, ২. আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়/ দেখে যা আলোর নাচন, ৩. বল্! বল্ রে জবা বল্/ কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল, ৪. ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে, ৫. মাগো আমি তান্ত্রিক নই/ তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা, ৬. জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্/ শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে, ৭. শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহধূপকাঠি তে, ৮. যে কালীর চরণ পায় রে/ ধর্মাধর্ম ভেদ জানে না সে বলে সবাই মায়ের ছেলে, ৯. আয় মা ডাকাত কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি, ১০. ওমা! তোর চরণে কি ফুল দিলে পূজা হবে বল/ রক্তজবা অঞ্জলি মোর হলো যে বিফল, ১১. শ্যামা তোর নাম যার জপমালা / তার কি মা ভয় ভাবনা আছে, ১২. শ্মশানে জাগিছে শ্যামা/ অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে, ১৩. কে বলে মোর মাকে কালো/ মা যে আমার জ্যোতির্মতী ইত্যাদি নজরুল রচিত উলেখযোগ্য শ্যামাসঙ্গীত।

ভজন

ভজনও এক ধরনের সাধনসঙ্গীত। এ গানের সুরের মধ্যে শান্ত সমাহিত একটা ভাব আছে। অনেক সময় তা রাগভিত্তিক হয়ে থাকে। তবু তার মধ্যে লোকজ সুর থাকে। এ ধরনের সুরেও সঙ্গীত রচনায় নজরুল যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন। ১. তিমিরবিদারী অলখবিহারী/ কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ, ২. অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি, ৩. খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে, ৪. সখি, সে হরি কেমন বল্, ৫. এল নন্দের নন্দন নবঘনশ্যাম, ৬. নব দুর্বাদলশ্যাম/ জপ মন নাম শ্রীরঘুপতি রাম, ৭. সৃজন-ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ, ৮. হৃদিপদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম– ইত্যাদি নজরুলের উৎকৃষ্ট ভজন।

কীর্তন

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয় নিয়ে কীর্তন রচিত হয়। এ গানের কথা ও সুরে এক আলাদা প্যাটার্ন রয়েছে। নেচে নেচে মৃদঙ্গমন্দিরা বাজিয়ে বাজিয়ে এ গান গাওয়া হয়। এ কায়দাটি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত। এ গানের সুরের একটা আলাদা মহিমা আছে। তাল ফেরতা ও সুর ফেরতা এ গানের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য। সুর কোথাও কোথাও দীর্ঘ ও প্রলম্বিত। ১. মোর মাধবশূন্য মাধবীকুঞ্জে (সখি গো), ২. আজি প্রথম মাধবী ফুটিল কুঞ্জে/ মাধব এল না সই, ৩. ওরে নীলযমুনার জল বল্ রে, মোরে বল্–/ কোথায় ঘনশ্যাম আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, ৪. গোঠের রাখাল, বলে দে রে/ কোথায় বৃন্দাবন, ৫. আজি মনে মনে লাগে হোরি/ আজি বনে বনে জাগে হোরি, ৬. সখি, আমিই না হয় মান করেছিনু/ তোরা তো সকলে ছিলি– ইত্যাদি নজরুলের উলেখযোগ্য কীর্তনাঙ্গের গান।

ভাওয়াইয়া

উত্তরবঙ্গের লোকগীতি ভাওয়াইয়া। সাধারণত রাখাল

বিশেষ করে যারা মহিষ চরায় কিংবা গাড়োয়ান কিংবা প্রোষিতভর্তৃকা নারীর আর্তি ফুটে ওঠে এ গানে। এ গানের সুর অন্য যে কোন গান থেকে ভিন্ন। টান থাকলেও হঠাৎ গলাটা ভেঙে সুর যেন আলাদা স্বরগ্রামে উপস্থিত হয়, অন্য রকম আবেদন সৃষ্টি করে। ভাওয়াইয়ার সুরে নজরুল যথেষ্ট গান রচনা করেছেন। ১. নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা। এরকম বেশ কিছু গান ভাওয়াইয়ার সুরে রচিত।

ভাটিয়ালি

সাধারণত ভাটি অঞ্চলের গানকে ভাটিয়ালি গান বলে। এ গানের বিশেষত্ব তার সুরে। নদীর স্রোতের মত সুর ভেসে চলে সুদূর পানে। এ গানের সুরও দীর্ঘ ও প্রলম্বিত। গানের সুরে দুঃখবোধ ও বিরহযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটে। এ গানের সুর করুণ। ১. আমার গহীন জলের নদী/ আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি, ২. ওরে মাঝি ভাই/ তুই কলস দেখে নামলি জলে রে/ এখন ডুবে দেখিস কলস নাই, ৩. কি হবে লাল পাল তুলে ভাই/ সাম্পানের উপর, ৪. নাইয়া, কর পার/ কূল নাহি, নদীজল সাঁতার, ৫. ও কূলভাঙা নদী রে/ আমার চোখের জল এনেছি মিশাতে তোর নীরে, ৬. কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘবরণ কেশ/ আমায় লয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ, ৭. আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের/ রূপ দেখে যা, আয় রে আয়, ৮. আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা ঠেলে/ আমি খুঁজে বেড়াই তারেই রে ভাই, ৯. একূল ভাঙে ওকূল গড়ে/ এই ত নদীর খেলা, ১০. পদ্মার ঢেউ রে–/ ও মোর শূন্য হৃদয়প দ্ম নিয়ে যা যা রে, ১১. গাঙে জোয়ার এল ফিরে, তুমি এলে কই/ খিড়কি দুয়ার খুলে পথপা নে চেয়ে রই, ১২. বাঁশী বাজায় কে কদম তলায়/ ওলো ললিতে/ শুনে সরে না পা পথ চলিতে। এমনি অসাধারণ কিছু ভাটিয়ালি গান রচনা করেছেন নজরুল যার সুরে নদীবাংলার লোকজীবন গ্রন্থিত।

ঝুমুর / সাঁওতালি

বর্ধমানবীরভূম অ ঞ্চলের সাঁওতালদের গানের একটা আলাদা ধরন আছে। তাদের জীবনের মধ্যে নজরুল কুড়িয়ে পেলেন যে গানের সুর তা থেকে সৃষ্টি করলেন ঝুমুর গান। এ গানের সুরে জোরাল একটা ঢং আছে। কিছুটা চপল গতির এ গানে নাচের ছন্দ থাকে। লোকমানুষ সৃষ্ট এ গানের সুর। এতে তাই মাটির গন্ধ মিশে থাকে। এ জাতীয় সুরে বহু গান রচনা করেছেন নজরুল। ১. রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে/ বাজে বাঁশের বাঁশি, ২. হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল/ এনে দে এনে দে নৈলে বাঁধব না বাঁধব না চুল, ৩. লাল নটের খেতে লাল টুকটুকে বৌ যায় গো, ৪. তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি। এরকম অসংখ্য উৎকৃষ্ট গান সাঁওতালি সুরে রচিত।

ইসলামি

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রতিভা বিস্ময়কর। যেমন ঋদ্ধ তাঁর কীর্তন, তেমনি তাঁর শ্যামাস ঙ্গীত, তেমনি ইসলামি গান। হাম্‌দ, নাত, মুর্শিদি, মারফতি, গজল ইত্যাদি ইসলামি ভাবাদর্শের অসংখ্য গান রচনা করেছেন নজরুল। আর এসব গান তত্ত্বে ও প্রাণস ম্পদে এতটাই পূর্ণ যে ধর্মপ্রাণ আত্মনিবেদিত মুসলমান ছাড়া তা রচনা করা মোটেই সম্ভব নয়। ইসলামি সঙ্গীত রচনায় নজরুল অনন্য। নজরুলের প্রচুর গানে ইসলামি চেতনার লোকজ উপাদান রয়েছে। যে বিষয়গুলো বাঙালির কৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ইসলামের ঐতিহ্য বাঙালি সংস্কৃতিরই অংশ। বিপুল সংখ্যক মুসলমান ধর্মীয়ভাবে যে উৎসব আচার প্রথা পালন করে থাকে তা মূলত লোকসংস্কৃতিরই উপাদান। আর এসব বিষয় নিয়ে রচিত গানগুলো লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে। আবদুল কাদিরের ভাষায়– 'তাঁর কবিতায় প্রতীকবাদ, প্যানইসলাম, সমাজত ন্ত্রবাদ প্রভৃতি পাঁচ মিশেলীর সাক্ষাৎ মিললেও তিনি নিঃসন্দেহে বাংলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি। তাঁর গানে তিনি নিজেকে আরো নিবিড় ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি গানে যেমন শ্যাম ও শ্যামার আরতি করেছেন, তেমনি হজরত মোহাম্মদের প্রশস্তিতে গদগদ হয়েছেন। একই সময়ে কীর্তন ও গজল গেয়েছেন। কখনও সাম্পান মাঝির ভাটিয়াল রাগে, কখনও সাঁওতালী ঝুমুরের সুরে গান ধরেছেন, কখনও হাফিজের প্রেমপ্র ভাবে মাতোয়ারা হয়েছেন। মোদ্দা কথা, বাংলার হিন্দুমুসলমা নের ঐতিহ্যকে তিনি অজস্র গানে সঞ্জীবিত করেছেন।' এরকম একটি গান– তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে/ মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে/ যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।

নজরুলের গানের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে লোকজ সুরের প্রয়োগ। বলতে গেলে লোকজ সুরই নজরুলের গানের সুরকে সমৃদ্ধ করেছে। যে সকল গানে লোকসুরের প্রয়োগ রয়েছে, সে সব গানে লোকজীবনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাহিত্যের অন্য যে কোন শাখার চেয়ে গানেই নজরুলের স্বকীয়তার প্রকাশ সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সার্থক। বাণী ও বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায়, সুরের ইন্দ্রজালে নজরুলের গান অনন্যসাধারণ। নজরুল নিজেই তা স্বীকার করে গেছেন– 'সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।' তাঁর গানগুলো লোকস ম্পদে পূর্ণ। বাংলার প্রাণস ম্পদে ভরপুর। গানে যেমন স্বদেশপ্রীতির পরিচয় মেলে, পরিচয় মেলে বিদ্রোহী-চেতনার। তাঁর গানের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামি ঐতিহ্য এবং হিন্দু ঐতিহ্য তথা বাঙালি সংস্কৃতির অনুরণন। যেমন প্রকাশ ঘটেছে মানবধর্মের, তেমনি প্রকাশ ঘটেছে সকল শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবিকার। নজরুলের গান যেন গ্রামবাংলার যথার্থ দর্পণ। বাংলার ঐতিহ্য এমন করে আর কোন কবি বুঝি আত্মস্থ করেননি। বিচিত্র দিকে বিচিত্রভাবে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নজরুল তাঁর কবিতায়, তাঁর গানে। *নজরুল-চর্চা* গ্রন্থে নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, 'নজরুল বাংলা গানের জগতের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরকার। একই সঙ্গে উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ ও ততোধিক উৎকর্ষময় সুরের সমন্বয়ে তাঁর গানগুলি হয়ে উঠেছে রসের এক চিরন্তন উৎস। যত দিন যাবে তত তাঁর গানের প্রচার বাড়তে বাধ্য, কারণ গানগুলির অপ্রতিবাদ্য সুরের যাদু। নজরুল আজ বেঁচে নেই কিন্তু তিনি তাঁর কবিতায় হয়ে আছেন প্রচণ্ড রকমে সরব আর তাঁর গানের সুর দুই বাংলার মানুষের নিত্যআন ন্দপ্র স্রবণ গভীর প্রাণময় এক সত্তা।'

বিষয় অনুসারে গানের ভাষা ও সুর নিরূপণ করেছেন তিনি। যাতে তা হয়েছে আরও প্রাণবন্ত ও জীবনঘনিষ্ঠ। নজরুল তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যে বার্তা কিংবা বাণীটি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন তা হল শ্রেণিহীন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মানবধর্ম, যা ঐতিহ্যগতভাবে বাঙালি লোকধর্মের ও স্বাদেশিকতার মন্ত্রে ভাস্বর। এই ঐতিহ্যপ্রীতিই নজরুলকে বাংলার লোকমানুষের নিকটজন করে তোলে, আপনার করে তোলে– নজরুল হয়ে ওঠেন বাঙালির আত্মজন।

সন্তোষ ঢালী শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

নজরুলের গানের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে লোকজ সুরের প্রয়োগ। বলতে গেলে লোকজ সুরই নজরুলের গানের সুরকে সমৃদ্ধ করেছে। যে সকল গানে লোকসুরের প্রয়োগ রয়েছে, সে সব গানে লোকজীবনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাহিত্যের অন্য যে কোন শাখার চেয়ে গানেই নজরুলের স্বকীয়তার প্রকাশ সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সার্থক। বাণী ও বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায়, সুরের ইন্দ্রজালে নজরুলের গান অনন্যসাধারণ।

ছোটগল্প

কোন এক ঝড়ের রাতে

সালেহা চৌধুরী

আমিরা বেগম বেশ কিছুদিন হল বিছানায়। স্বামী মারা গেছেন যখন ছেলে আকাশপ্রদীপ দশ বছরের। স্বামী স্কুলে মাস্টারি করতেন। সাহিত্য ভালবাসতেন। তাই ছেলের এমন একটা নাম রেখেছিলেন। আকাশপ্রদীপ আজিজ। ওর আর কোন ভাইবোন হয়নি। দশ বছরের ছেলেকে বুকে করে জীবন কাটিয়ে দিলেন আমিরা বেগম। কাটানো যায় তখনই যখন একজনের ভালবাসার উজ্জ্বলস্মৃতি প্রদীপের মত জ্বলে থাকে। সেইসব স্মৃতি আর ছেলে নিয়ে দশ বিঘা জমির আয় রোজগারে ভালই চলছিল তাঁর। কিন্তু ছেলে বিএ পড়তে পড়তে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেল। মা তখন কী করে বাধা দেবেন? কোন মাই কী সেইসময় ছেলেমেয়েদের বাধা দিতে পেরেছিলেন? পারেননি। যখন সব মায়ের মনেই নতুন দেশের স্বপ্ন ছিল। বলেছিলেন কেবল– দেশ স্বাধীন করে ফিরে এসো বাবা। একটা কালো সুতায় একটা তাবিজ ঝুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন– এই তোমাকে একদিন আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। এই তাবিজই বোধহয় এক রাতে এনেছিল ছেলেকে কাছে। ছেলে মায়ের হাতে কলা দিয়ে মাখানো দুধভাত খেতে বসেছিল। ঘাড়ের বন্দুকটা কাছে রেখে টিমটিমে আলোতে দুধভাত খেতে খেতেই বুঝতে পেরেছিল– চেয়ারম্যানের বদমায়েশ পাকিস্তানের দালাল ছেলেটার পায়ের শব্দ। ছেলে দুধভাত শেষ না করে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল– ধরা পড়েনি।

কে এসেছিল খানিক আগে? হুংকার তখন বাঘের মত।

কেউ না বাবা? আমার ছোট ভাই আর আমিই থাকি এখানে।

মিথ্যা কথা বলছেন আপনি?

আকাশপ্রদীপ আর আসেনি। দেশ স্বাধীন হবার পরেও নয়। ভাই মুনির আর মা আমিরা বেগম পার করে দিয়েছে প্রতীক্ষার চল্লিশ বছর। এখন মায়ের বয়স সাতষট্টি। আর মুনির পঁয়ষট্টি বছরের একজন। মুনির আর আমিরা। এই বাড়িতে আর কেউ নেই। দুধের গাইটা মা কাকে যেন দান করেছিলেন। আর কলার ঝাড়টা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মা দুধ আর কলা দেখলে ডুকরে ওঠেন বলে মুনির সেগুলো আর বাড়িতে আনেন না। এখন আর আমের মোরব্বা, সুজির মোহনভোগ, গরুর মাংস আর বুটের ডাল রান্না হয় না।

না বাবা। ছোটভাই ঘরে ঢুকে বলেছিল– কে আসবে?

কেন আপনাদের মুক্তিযোদ্ধা। শালা মালাওনের সঙ্গে যুক্তি করে সোনার পাকিস্তানকে খতম করতে বসেছে।

ও যে কী করছে আমরা কী করে বলি বাবা? ও তো আমাদের বলে যায়নি।

চেয়ারম্যানের ছেলে বাদশাহ কেবল গরম চোখে সারা বাড়ি সার্চ করে চলে গিয়েছিল। যাওয়ার পর পরই মা পড়েছিলেন একশো রাকাত শোকরানার নামাজ। ছেলের জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন আর প্রার্থনা করেছিলেন ওর জীবনের।

আকাশপ্রদীপ আর আসেনি। দেশ স্বাধীন হবার পরেও নয়। ভাই মুনির আর মা আমিরা বেগম পার করে দিয়েছে প্রতীক্ষার চল্লিশ বছর। এখন মায়ের বয়স সাতষট্টি। আর মুনির পঁয়ষট্টি বছরের একজন। মুনির আর আমিরা। এই বাড়িতে আর কেউ নেই। দুধের গাইটা মা কাকে যেন দান করেছিলেন। আর কলার ঝাড়টা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মা দুধ আর কলা দেখলে ডুকরে ওঠেন বলে মুনির সেগুলো আর বাড়িতে আনেন না। এখন আর আমের মোরব্বা, সুজির মোহনভোগ, গরম্নর মাংস আর বুটের ডাল রান্না হয় না। কুলের টকমিষ্টি আচার বোয়াম ভরে থাকে না। আরো কতকিছু আমিরা বেগম করতে পারেন না। এগুলো আকাশপ্রদীপের প্রিয় ছিল। এখন তিনি অসুস্থ। প্রায়ই শুয়ে থাকেন বিছানায়। ভাবেন কখন চলে যাবেন তিনি। মুনির বিয়ে করেননি। বোনকে দেখেন আর আপনমনে কী সব লেখালেখি করেন। বাদশাহ এখন গ্রামের মাতব্বর। লোকজনের স্মৃতিশক্তি বোধকরি খুবই দুর্বল তাই বাদশাহর মাতবরিকে মেনে নেয়। না হলে ওকে তো কুকুর দিয়ে খাওয়ান উচিত ছিল।

আমি বোধহয় আর বাঁচব নারে মুনির। আকাশের বাপ স্বপ্নে আসে। বলে এইতো আর কয়দিন পর তুমি আমার কাছে চলে আসবে।

আকাশ! ওকে দেখ না?

নারে মুনির। তখন দুই ভাইবোন আশা করে আকাশপ্রদীপ এখনো কোথায় বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায়? আমিরা বেগমের বিছানার পাশে এসে বসে মুনির। তারপর কথা ফুরিয়ে যায় দুই ভাইবোনের। ওর মৃতদেহের কথা কেউ জানে না। ওর মৃত্যু কেউ দেখেনি। কোথায় আকাশ? কিন্তু বেঁচে থাকলে সেকি আসবে না? শত শত টুকরো হয়ে কোন কোন মৃতদেহ একদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন আকাশ কী তেমন একজন? না হলে নদী থেকে ভেসে সাগরে গিয়েছিল, তেমন একজন। কে জানে।

কি লিখিস তুই মুনির?

কী লিখব! যা মনে হয় লিখি। মুনির জবাব দেয়। পায়ের একটা ভাঙা। ফলে তার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না সেদিন। সেটাই তার সবচেয়ে বড় দুঃখ। ভেঙেছিল ছোট বয়সে। যা জোড়া লাগেনি। এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

বই করবি না?

না। সময় কাটানোর জন্য লিখি। বই করবার কথা ভাবিনি।

ডাক্তার এসে বলেন– আমিরা বেগমের সময় আর বেশি নেই। দেখছেন না দ্রুত ক্ষয় হতে চলেছে।

মুনির কোন কথা বলেন না।

সন্ধ্যা থেকে আকাশে স্তূপ স্তূপ মেঘ। একটা চায়ের দোকানে এসে মাঝে মাঝে মুনির বসেন। স্কুলের হেডমাস্টার আর উনি গল্প করেন। কিন্তু এই ঘনঘোর, ঝড় ঝড় রাতে তিনি আসেন না। মুনির বসে চায়ের অর্ডার করেন। বাতি নেই চায়ের দোকানে। হয়তো খানিকপর দোকান বন্ধ করে চলে যাবে দোকানদার। তিনি একটা কাগজে কী লিখছেন বলেন– আর দুই কাপ চা খেয়ে চলে যাব। তুমি খুব ভাল চা বানাও মাখন। মাখন খুশি হয়ে আরো দুইকাপ চা দেবে বলে তৈরি হয়।

চোখ তুলে চমকে যান সামনে কে বসে আছে। একি আকাশ? একুশ বছরের আকাশ? কিন্তু এখন তো ওর বয়স। তার মাথা তখন সুস্থ চিন্তা করতে পারছে না। তিনি হাঁ করে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। – মামা আমি সাগর।

সাগর? কোন সাগর? কোথাকার সাগর?

আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মারা যান। আকাশপ্রদীপ আর আমার বাবা একই বাংকারে থাকতেন। বাবা মারা গেলে আমি আকাশপ্রদীপের একটা ছেঁড়াখোঁড়া ডায়েরি পাই মামা। তাই ওকে জানি। ডায়েরিটা বাবার কাছে ছিল।

কী জানো?

ওর মায়ের কথা, আপনার কথা, বকুলের কথা।

বকুল বলে একজন গ্রামের মেয়েকে বোধকরি ভালবাসত আকাশপ্রদীপ কিন্তু সেটা ওদের খুলে বলেনি কোনদিন। মাঝে মাঝে আসত মেয়েটা। তারপর একদিন বিয়ে হল সেই মেয়ের।

বকুল? ওতো গতবছর মারা গেছে সাগর।

জানি মামা।

তুমি কী করে জানলে? আকাশ কোন কথা বলে না। বলেন তিনি– চা খাবে সাগর?

না মামা। আমি কেবল মাকে মানে আকাশপ্রদীপের মাকে একটু দেখব।

ওতো ভাল করে চোখে দেখে না। কেবল ঠাহর করে চলে। বেশিদিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। ক্ষয় হতে হতে বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে।

মাকে বলবেন– আমিই আকাশপ্রদীপ।

বলব। ওর মাথাওতো তেমন কাজ করে না। বয়সের হিসাব করতে পারবে না।

মায়ের দেওয়া কালোসুতার তাবিজটা দেখায় সাগর। বলে– মা বলেছিলেন এটা পরিয়ে দিলাম। একদিন তুই এরজন্যই ফিরে আসবি।

এটা তুমি কোথায় পেলে? এত কথা কেমন করে জানলে?

ওর ডায়েরি পড়ে মামা। তিনি অবাক হয়ে সাগরকে দেখেন। বলেন– এটা আল্লাহরই ইচ্ছা। হঠাৎ করে তুমি এসে গেলে। বলেন তিনি আকাশ কী কী পছন্দ করত সেইসব কথা। মাথা আর চোখ ঝাপসা হয়ে যাওয়া মা যদি তার আকাশপ্রদীপকে পেয়ে একটু ভাল বোধ করে– তাই। সাগর হেসে বলে– আপনাকে এত কিছু বলতে হবে না মামা।

সারারাস্তা সাগর ওর বাবার কথা আর আকাশপ্রদীপের কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল। কিন্তু ও বলতে পারল কী ভাবে আকাশ মারা গেছে। বলল কেবল– বাবা বলেছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা পিঠে গুলি লেগে পড়ে গিয়েছিল নদীতে। তারপর তার লাশ আর কেউ দেখেনি। মনে হয় পিঠের ভারী বন্দুক, পকেটভর্তি গুলি আর গ্রেনেড তাকে ভেসে থাকতে সাহায্য করেনি। হয়তো এখন সাগরে চলে গেছে।

আমি সব জানি। ডায়েরিতে সব লেখা ছিল।

সব?

সব। বকুলের কথা আর আপনাদের কথা। ওর প্রিয় খাবারগুলোর কথা, মায়ের হাতের বানিয়ে দেওয়া নীল সোয়েটারের কথা।

ও তুমিওতো একটা নীল সোয়েটার পরে এসেছ?

চলেন তাহলে আমরা একটু মিথ্যা করে মাকে ভুলিয়ে দেই।

সারারাস্তা সাগর ওর বাবার কথা আর আকাশপ্রদীপের কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল। কিন্তু ও বলতে পারল কী ভাবে আকাশ মারা গেছে। বলল কেবল– বাবা বলেছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা পিঠে গুলি লেগে পড়ে গিয়েছিল নদীতে। তারপর তার লাশ আর কেউ দেখেনি। মনে হয় পিঠের ভারী বন্দুক, পকেটভর্তি গুলি আর গ্রেনেড তাকে ভেসে থাকতে সাহায্য করেনি। হয়তো এখন সাগরে চলে গেছে। আর বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই হুড়মুড় করে আকাশ ভেঙে পড়ল। পৌষের প্রথম দিনে এমন ঝড় তখন কেউ আশা করেনি। কোনমতে মাথা বাঁচিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছায় ওরা। মুনির বলেন– সামনের দরজাটা বন্ধ থাকে। দিনের বেলা একজন এসে আকাশের মাকে খাওয়ায়, গোছল করায়, কাপড় পরায়। সন্ধ্যায় চলে যায়। এরপর আর ও দরজা খোলা হয় না। চল আমরা পেছনের দরজা দিয়ে যাই।

পেছনের দরজার ওপারেই ছিল কলাগাছের বাগান। এখন তা প্রায় শূন্য। দু'একটি গাছ কোনমতে বেঁচে আছে। মুনির বলেন– আকাশপ্রদীপ যাওয়ার পর এ গাছের আর যত্ন হয় না। যখন দু'একটা গাছে কলা হয় পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে যায়।

আনারসের গাছগুলোও শেষ?

তুমি কী করে জানলে?

আকাশপ্রদীপের দিনান্তলিপিতে লেখা ছিল। টর্চবাতি ফেলেন মুনির সেই গাছপালার ওপর। বলেন– আরে দেখেছ খেয়াল করিনি তো একটা গাছে কেমন কলা পেকে ঝুলে গেছে। দাঁড়াও দাঁড়াও কয়েকটা কেটে বাড়ি নিয়ে যাই। পুরো কাঁদিটা কাল কাটা যাবে। দেখি আমিরাবুবু কী বলেন।

পকেটে চাকু নিয়ে ঘোরেন মামা?

থাকে একটা মুখবন্ধ চাকু। রাখি। এই বলে তিনি সেই চাকু দিয়ে কয়েকটা কলা কেটে নেন। আকাশপ্রদীপ বলে– মা বলতেন রাতে গাছের ফল কাটতে নেই।

ওটাও ডায়েরিতে লেখা ছিল?

সব মামা। মুনির আর কথা বলেন না। এ বাড়িতে এখন আলো নেই। সন্ধ্যার একপেট তেল খাওয়া হারিকেন জ্বলছে। কখন যে বিদ্যুৎ আসে আর যায় তার ঠিক নেই। আমিরা বেগমের গায়ে পাতলা একটা চাদর। তিনি কী জেগে? ওদের পায়ের শব্দে বলেন– মুনির তাঁর আওয়াজ ক্ষীণ। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। সাগর গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। আমিরা বেগম কে কে বলতে বলতে উঠে বসতে চান। মুনির কিছু বলবার আগেই তাঁর আর্ত চিৎকার শোনা যায়। আকাশ আমার আকাশ। আকাশ গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ায়। সে হাসছে। বলে– কেমন আছ মা?

এতদিন পর এলি তুই? এতদিন পর? এতদিন ছিলি কোথায়?

সাগর উত্তর না দিয়ে আমিরা বেগমের মাথাটা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেয়। আমিরা বেগম ঝাপসা মাথায় বুঝতে পারেন না এতদিন পরে যে এল তার বয়স কেমন করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি ওর চোখে মুখে হাত বোলান। কতকিছু বলতে চান। পারেন না। কেবল দরদর ধারায় তার দুই চোখের পানিতে সাগর ভাসতে থাকে। খানিকপর বেশ খুশি খুশি গলায় বলে– মা আমার দুধ্ব ভাত কৈ? দুধ্ব ভাত আর কলা। খাওয়াটা আজ শেষ করে নেব। কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। মুনির বলেন– তুমি বস বাবা আমি দুধ আর ভাত আনি। একটু দুধ থাকে মুনিরের নিজের ঘরে। চা বানানোর জন্য। একটা থালিতে সেসব নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন মিটসেফ খুলে আমের মোরব্বা বের করছে সাগর। –দেখ মা তোমার হাতের আমের মোরব্বা কতদিন খাওয়া হয়নি। ঝাপসা মাথায় আমিরা বেগমের মনে পড়ে না তিনি এসব আর বানান না। বলেন– পেয়েছিস? তাহলে খেয়ে ফেল। আমের মোরব্বা, কুলের মিষ্টি আচার, সুজির মোহনভোগ যাদুকরের মত একটি একটি করে সব বের করে সাগর। মাকে দেখায়। আমিরা বেগম হেসে ওঠেন। বলেন– সব ভুলে যাই আকাশ। কখন যে এসব করেছি মনে থাকে না। মুনির অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন। কিছু বলেন না। বালিশে মাথা রেখে সাগরের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছেন আমিরা বেগম। তার চোখেমুখে চাপা আনন্দ। বলেন– তোর সব প্রিয় জিনিস। দেখ দেখি কেমন ঠিক করে রেখেছি আমি।

দুধ্ব কলামাখা ভাত এক মুহূর্তে শেষ। মনে হয় কতদিন খায়নি সাগর। আমিরা বেগম বলেন– খা বাবা খা। থালাটা শূন্য এবং শুষ্ক। কেউ এখানে কিছু খেয়েছে বোঝা যায় না। মুনির জানেন তার ছানি কাটাতে হবে কিন্তু তবু সবকিছুই এখন তাঁর কাছে বিস্ময়কর। তিনি কেবল অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন। সাগর মায়ের বুকের কাছে বসে। তাঁর আঙুল নিয়ে খেলা করে। যেমন করে সে খেলা করত। আমিরা বেগমের কী এখন কোন অসুখ নেই? বলেন তিনি– আমি জানতাম তুই একদিন ফিরে আসবি। কারণ আমার দেওয়া তাবিজ। ওটা কী এখনো তোর গলায় আছে? সাগর সোয়েটার্ল গেঞ্জির ভেতর থেকে তাবিজ বের করে। আমিরা বেগম তাবিজ নেড়ে দেখেন। বলেন– আমি জানতাম তোকে একদিন আসতেই হবে। তারপর আবার নানা কথা। যখন তার চোখের পাতা একটু ধরে এসেছে মুনির সাগরকে বাইরে ডাকেন। ঝড় নেই, মেঘ নেই। একটু ভাঙা চাঁদ আকাশে মেঘের ভেতর থেকে তার অস্তিত্ব জানান দেয়। বলেন তিনি– আমার বোনের দিন শেষ। এখন আজ না হয় কাল চলে যাবেন। তোমাকে একটা কথা বলি– ওর দশ বিঘা জমি ও দান করেছে এখানকার মসজিদে। ও মারা গেলে জমিগুলো তারা নেবেন। আর এই বাড়িটা? গ্রামের একটা বাড়ি। কীই বা তার দাম?

তখন সাগর হাসে। বলে– ভালই করেছেন। বাবা বেঁচে থাকলেও তাই করতেন।

দুধ্ব কলামাখা ভাত এক মুহূর্তে শেষ। মনে হয় কতদিন খায়নি সাগর। আমিরা বেগম বলেন– খা বাবা খা। থালাটা শূন্য এবং শুষ্ক। কেউ এখানে কিছু খেয়েছে বোঝা যায় না। মুনির জানেন তার ছানি কাটাতে হবে কিন্তু তবু সবকিছুই এখন তাঁর কাছে বিস্ময়কর। তিনি কেবল অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন। সাগর মায়ের বুকের কাছে বসে। তাঁর আঙুল নিয়ে খেলা করে। যেমন করে সে খেলা করত। আমিরা বেগমের কী এখন কোন

আমিরা বেগম বোধকরি ওদের ডাকছেন। ওরা আবার ঘরে ঢোকে। –মুনির তুই খাটের তলা থেকে আমার বাক্স বের কর। তখনি আবার যাদুকরের মত বলে সাগর আমি বের করছি মা। জানি কোন বাক্সটা তুমি দেখাতে চাও। মুনির আবার গরম চোখে ছেলেটাকে দেখেন। একটা বাক্সে ছেলের বউকে দেবে বলে বেশ কিছু গয়না আছে। বিয়েতে খরচ হবে বলে কিছু টাকা আছে। যেগুলোর কথা কখনো আমিরা বেগম কাউকে বলেননি।

তুমি এসব পাবে না।

আমি এসব নেব কেন?

কেন? তাহলে এমন যাদু দেখাতে শুরু করেছ কেন? তুমি কী যাদুকর? আমার স্পষ্ট মনে আছে গাছে কোন কলা ছিল না সেখানেও পাকাকলা এসে গেল? কোথায় আমের মোরব্বা, কোথায় কুলের আচার, কোথায় সুজির মোহনভোগ! সব জেনে এসেছ তুমি? কতক্ষণ পর তোমার মরা প্রিয় বেড়ালটাও ম্যাও করে উঠবে মনে হয়। –মরা বেড়াল? ওইতো আমার কালোসোনা ওখানে। দেখেননি। মুনির চোখ ঘসেন। উঠোনে একটা বেড়াল বসে আছে। গায়ের রং বোঝা যায় না। –মাকে ভোলাতে খাবারগুলো ব্যাগে করে এনেছিলাম, তাই।

আর কলা?

গাছটা সদয় হয়েছেন মনে হয়। গাছের প্রাণ আছে জানেন না।

দেখেননি মা আমাকেই আকাশপ্রদীপ ভাবতে শুরু করেছেন। একটা সান্ত্বনা পাবেন যেতে যেতে। মৃত্যুর আগে একটা ইচ্ছাপূরণ।

তুমি কী থাকবে ও যতক্ষণ বা যতদিন বেঁচে আছেন?

থাকব। যতক্ষণ বা যতদিন বেঁচে থাকবেন।

মুনির আর কিছু বলেন না। আমিরা বেগম বোধকরি ওদের ডাকছেন। ওরা আবার ঘরে ঢোকে। –মুনির তুই খাটের তলা থেকে আমার বাক্স বের কর। তখনি আবার যাদুকরের মত বলে সাগর আমি বের করছি মা। জানি কোন বাক্সটা তুমি দেখাতে চাও। মুনির আবার গরম চোখে ছেলেটাকে দেখেন। একটা বাক্সে ছেলের বউকে দেবে বলে বেশ কিছু গয়না আছে। বিয়েতে খরচ হবে বলে কিছু টাকা আছে। যেগুলোর কথা কখনো আমিরা বেগম কাউকে বলেননি। –ও তাই। গয়নার লোভে আসা হয়েছে। কিন্তু এখন বাধা দেওয়া যায় না। ঠিক বাক্স বের হয়েছে। সোনার মালা, কানের কানপাশা, হাতের বালা, চুড়ি এবং টিকলি। ভরিদশেক সোনা তো হবেই। প্রায় বিশ লাখ টাকার সম্পত্তি। বলেন তিনি– আজ রাতেই এসব দেখাতে হবে ওকে।

কেন আজ রাতইতো ভাল। স্পষ্ট গলায় কথা বলেন– আমিরা বেগম। ওর বউ পরবে। আমিতো এগুলো কাউকে দিতে পারিনি। খুব সুন্দর করে সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখছে সাগর। মুনিরের তখন ভয় করে। ছেলেটা শেষপর্যন্ত তাকে মেরে গয়নাগুলো নিয়ে পালাবে। কোন দুঃখে ছেলেটাকে বাড়িতে এনেছেন তিনি। ইমোশন! একটা পচা বোকা ইমোশনে কী হবে কে জানে। বলে সাগর– এগুলো বকুলকে খুব মানাত।

বকুল? মা ঠিক মনে করতে পারেন না কোন বকুলের কথা বলছে তার আকাশপ্রদীপ। বলে সাগর– এবার সব গুছিয়ে রাখি মা। দেখাতো হয়ে গেছে।

রাখ বাবা। বলতে বলতে আমিরা বেগমের চোখ আবার বন্ধ হয়ে যায়। ঘড়িতে তখন রাত অনেক। বলেন মুনির এবার– শোন ছেলে তুমি এবার পাশের ঘরে ঘুমাও।

আমি মায়ের পাশেই বসে থাকি। কতদিন পর মাকে পেলাম মামা। তিনি বিরক্ত হন। বলেন– ওকে ঘুমাতে হবে। এত কথা বলা, জেগে থাকা ঠিক নয়।

আমি আর কথা বলব না তাহলে। কেবল চুপ করে বসে থাকব।

মুনির ঘুমাতে ভয় পান। বলেন– তুমি বসে থাকলে আমি ঘুমাই কী করে? তোমাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক নয়।

তাহলে গয়নার বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে যান। ঠিকইতো আমি কে, কোথাকার সাগর। এখানে গয়নাগাটি টাকা পয়সার ভেতর রেখে যাওয়া ঠিক নয়। আপনি বাক্সটা নিয়ে চলে যান মামা। এই তো খানিকপরেই সকাল হবে। কাল থেকে পাশের ঘরে আমার ব্যবস্থা করবেন। ছেলেটা তার ব্যাগ খোলে। কিছু নেই সেখানে, কেবল কতগুলো বই। তিনি বলেন– এগুলো তো আকাশের বই। ওর প্রিয় বই। তুমি–

আমার বাবার কাছে ছিল। বলে আবার সাগর– যান মামা। বাক্সটা নিয়ে চলে যান। আমি একটা বই পড়তে পড়তে সকাল করে ফেলব। ভেতর থেকে ভাল করে দরজা বন্ধ করে ঘুমাবেন মামা।

আমি এই ঘরেই ঘুমাই। বিশেষত ডাক্তার যখন বলেছেন– অল্প কয়েকদিন আছে আমার বোনের।

তাহলে আপনি ঘুমিয়ে পড়েন। আমি বসে থাকি। রাতজাগা পাখি ডানা ঝাপটায়। গাছের পাতারা শর শর করে। তার কেমন ভয় করতে থাকে। বলেন– তুমিতো বড় জেদি ছেলে। পাশের ঘরে কেন যাবে না? ছেলেটা মামার চোখের দিকে তাকায়। মামা সম্মোহকের মত তাকিয়ে থাকেন। বলে সাগর– আমাকে ভয় পাবেন না মামা। তিনি ঝগড়া বা তর্ক করবার শক্তি হারান সেই দৃষ্টির সামনে।

তিনি ঘরের এক পাশের ছোট খাটটায় গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়েন। বালিশের নিচে ছোট চাকুটা রাখেন। মনে হয় তাঁর কথা বলবার শক্তি নেই এবং মনে মনে ভাবেন কিছুতেই ঘুমাবেন না।

তখনো ভাল করে সকাল হয়নি। তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখতে না পারার ঘুম থেকে তিনি ধড়মড় করে জেগে ওঠেন। ছেলেটা নেই। যা ভেবেছিলেন তাই? প্রথমেই তিনি দেখেন বাক্সটা। ওটা ঠিকই আছে কিন্তু ঘরের দরজা খুলে চলে গিয়ে ছেলেটা আবার বন্ধ করেছে। তাই বোধহয় দরজা বন্ধ। সদর দরজা খোলা। এ বাড়ির লোকজনই কেবল জানে সদর দরজা কী ভাবে খোলা যায়। ছেলেটা কী করে জানল? তিনি ছুটে বাইরে আসেন। ঝড় নেই। বৃষ্টি নেই। খানিকপরেই সকাল হবে। তখনো আঁধার। তিনি ভাঙা পায়ে ছুটতে ছুটতে সদর দরজার কাছাকাছি চলে আসেন। চোখ ঘষেন। ওইতো ছেলেটা চলে যাচ্ছে। ছেলেটা মুখ ফেরায়। তার পরনে মুক্তিযোদ্ধার সাজ। কাঁধে একটা বন্দুক। মাথায় ক্যাপ। কাঁধে গুল্লি গ্রেনেড ভর্তি রুকস্যাক। আকাশপ্রদীপ! তিনি চোখ ঘষেন। ছেলেটা হাত তোলে। শুনতে পান ছেলেটা বলল একবার দূর থেকে– জয় বাংলা। তারপর? তিনি চোখ ঘষেন। রাস্তায় কেউ নেই।

আমিরা বেগমের ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না। তার মুখে প্রথম রোদের মত অম্লান হাসি।

তখনো ভাল করে সকাল হয়নি। তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখতে না পারার ঘুম থেকে তিনি ধড়মড় করে জেগে ওঠেন। ছেলেটা নেই। যা ভেবেছিলেন তাই? প্রথমেই তিনি দেখেন বাক্সটা। ওটা ঠিকই আছে কিন্তু ঘরের দরজা খুলে চলে গিয়ে ছেলেটা আবার বন্ধ করেছে। তাই বোধহয় দরজা বন্ধ। সদর দরজা খোলা। এ বাড়ির লোকজনই কেবল জানে সদর দরজা কী ভাবে খোলা যায়। ছেলেটা কী করে জানল? তিনি ছুটে বাইরে আসেন। ঝড়

সালেহা চৌধুরী লন্ডনপ্রবাসী শিক্ষাবিদ, কবি, কথাসাহিত্যিক

এন্টিবায়োটিক

জুলফিকার রাসেল

মনের কী দোষ বল? জোর করলেও বন্দি সে হবে না
সে তো খাঁচায় শেকল পরা পাখি নয়
একটু তাকাও! ধর হাত, ধর, পৃথিবীর কেউ জানবে না
এ হাত হয়তো দেখ তোমার মনের মত নয়, তবু কাটবে সংশয়।

এ হাত পেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সনদ– শুধু তুমি ছোঁবে বলে
মনের অসুখ কেটে যাবে, উষ্ণ পরশে এ হাত হবে
শুধু তোমারই মন ভাল করবার এন্টিবায়োটিক, তাই বলে এস না সদলবলে,
একা, আগামীকালের জন্য পথ খোলা রেখে এস, আড়ালে নীরবে।

অনুভব মাথা থেকে আসে না, বুকের ঠিক যেখানে বিশাল নদী
যেখানে চাঁদের ছায়া পড়ে, যেখানে ঠিকরে পড়ে মানুষের আলো
ফাউ খাওয়ার দল যে স্রোতের নেচে ওঠার কারণ নয়, তুমি যদি
সেখানে না আস– কী করে বুঝবে অনুভব, কী করে বুঝবে বল, বিদ্যুৎ চমকাল?

মনের কী দোষ বল? সে তো খাঁচায় শেকল পরা বন্দি পাখি নয়
এ হাত মুঠোয় ধর, এ হাত ঘোচাবে আজ সকল সংশয়।

আকাশ ছোঁয়া হাত

রাহমান ওয়াহিদ

কষ্টের মন ছোঁয়া একটিই হাত–
রবীন্দ্রনাথ
'জল পড়ে, পাতা নড়ে'– একটিই রাত–
রবীন্দ্রনাথ।
পদ্মার বোটে জমে গল্পের মেলা
সোনার তরী বেয়ে জমিয়ে খেলা
ভেসে যায় সুন্দর আহা; কাটে সারারাত।
হাঁটে মহাকাল দারুণ দাপটে
শত সহস্র প্রশ্ন পশ্চাতে ছোটে
মেলে না উত্তর; তবুও সম্মুখে উত্থিত
আকাশ ছোঁয়া হাত...।

রবিরই তাপে নামে জলের প্রপাত
রবীন্দ্রনাথ
হৃদয়ের নামতায় একটিই ধারাপাত
রবীন্দ্রনাথ।

সীমানা ছাড়িয়ে

উস্রি দে

বিকেলের নরম রোদ্দুর ডানায় মেখে
পাড়ি দেয় শঙ্খচিল,
এপার ওপার– একাকার
ইছামতির ঢেউয়ে দোলে
প্রতিচ্ছবি অনাবিল।
নিঃসীম নীলের মাঝে
অফুরান উড়ান,
কাঁটাতারের বেড়ায় মানে না
কোন ব্যবধান।
এপারের মেয়ে কলসী কাঁখে
হেঁটে যায়–
ওপারে সন্ধ্যা নামে, শাঁখ বাজে
সোনার গাঁয়ে,
ক্লান্ত ডানা ঝাপটিয়ে গাছের পাতায়
শঙ্খচিল নীরবে রাত পোহায়।
আঁধার পেরিয়ে আসে রূপোলি ভোর
দিগন্তেম্ম মেলে পাখা–
নিষেধের বেড়াজালে শঙ্খচিলকে
যায় না বেঁধে রাখা,
যেমন যায় না বাঁধা ওপারের
দুঃখ কিংবা সুখ
ছুঁয়ে যাওয়া এপারের মন
আকুল, উন্মুখ
মন মেলে ডানা, পার হয়ে যায় সীমানা
শঙ্খচিল যে রেখে গেছে তারই ঠিকানা!

উস্রি দে ভারতের কবি

শেষ বিকেলের কষ্ট

রিপন আহম্মেদ

মৌ মৌ ঘ্রাণে রাস্তার চারপাশে
অনেক মানুষের ভীড়,
কষ্ট করে মাথাটা উঁচু করে
হাত নাড়তেই ঋতুপর্ণা সেন
মুচকি হেসে চোখের পলকে
হারিয়ে গেল অগণিত মানুষের মধ্যে।

শেষ বিকেলের দিকে
জেসগার্ডেনের পাশে অনেক মানুষের আনাগোনা
ভাবি হয়তো বা ওখানেই আছে, ঋতুপর্ণা সেন
ছুটে যাই জেসগার্ডেনে।
শুটিংয়ে ব্যস্ত কোয়েল মলিক।
নিজেকে বড় প্রসেনজিৎ ভাবতে ইচ্ছে করল।
ঘড়ির দিকে তাকাতেই বলল– যেতে হবে।

পাগলামী

রোকসানা আফরীন

ঈশ্বরের এই বাগানে
আমি এসেছি তোমার খোঁজে
তোমার সাথে আমার কিছু
গোপন কথা আছে

ব্যস্ত থাকো, ব্যস্ত তুমি
কখন সময় হবে
দিন ফুরিয়ে রাত গড়ালে
আর কি মনে রবে?

শুনতে হবে আমার কথা
গাইতে হবে গান
একশো গোলাপ কইবে কথা
জ্যোৎস্নাভেজা তান

চোখের উপর চোখ রাখবে
হাতের উপর হাত
আমার ঠোঁটে রাখবে তোমার উষ্ণ ওষ্ঠ-রাত

বলব আমি, বলবে তুমি
গহীন হবে গুনগুনানি
তোমার কথা শুনে শুনে
মাতাল মাতাল লাগে
পাগল আমি, পাগল তুমি
অথই পথের বাঁকে।

সমাধি

জয়শ্রী রায়

নক্সী-কাঁথায় নামে নিসর্গ-চেতনা–
অলস-আঘ্রাণ তাই পূতিগন্ধময়,
শুদ্ধ-সত্ত্ব আনন্দের উপমায় নিবেদিত চেতনা
জ্ঞানজ্যোতি পুরুষ ক্ষণিকের প্রতীক্ষায়–
জরাজীর্ণ কলেবর সাধনার অন্তিমলগ্নে,
মসি ও অসিতে লাগে বিজয়-তিলক,
সেতার নীরব হয় কর্ণকুহরে–
প্রাণবায়ু আজ অন্তিম-শয়ানে।

জয়শ্রী রায় ভারতের কবি

অসীম সকাল

রেজাউদ্দিন স্টালিন

সুদিন আসবে বলে
অপেক্ষায় কারা,
পদাবলী অস্তাচলে
লালনের
কাঁদে একতারা।

কাদের চেতনাজুড়ে
অহিংসার বাণী,
ঘুমায় অন্তঃপুরে
বহুদিন
কচ ও দেবযানী।

জাতি আজ দুর্বিপাকে
জানে হেফেস্টাস,
সবাই খুঁজছে যাকে
বীরবাহু
সে কি হেরাকাস!

সামনে কোথাও নেই
অশোকের কাল,
জন্মেছি রণাঙ্গনেই
মেঘে বাজে
অসীম সকাল।

ভোরের সানাই

আনন্দমোহন রক্ষিত

দুঃখ যদি দাও শুধু
দুঃখই দাও
ডেক না আমারে তুমি
ভোরের সানাই।
জীবনের রথ যদি থামাতে চাও
তাতেও আপত্তি নেই
ফের যদি আশা জাগে
এ পৃথিবী ডাকে বারে বার
এমন উদাস মন পাই যদি ফিরে
তখন দিও তুমি যত অভিশাপ।

রাজা ও রানী

শরীফ শাহরিয়ার

যদি বসন্তই রাজা– তবে পথে নেমে
দিগ্বিদিক রানীকে খুঁজি
দেখি বৈশাখের ঝড়ো উন্মাদিনী
বিদ্যুৎ চাহনি ঢালে বিরহ-আক্রোশে

এইভাবে প্রকৃতির জামাজুতো ছেঁড়ে
স্বপ্নের বোতাম সেলাই-বন্ধন খুলে
ছত্রখান নিরুদ্দিষ্ট পথে– রাজা
হতশ্রী, সকল ফুলসাজ নিমেষে হারিয়ে

রিক্ত, হতাশ বদনে জপে গমনের গতি
বিরহ-মিলন খুব প্রাকৃতিক, তবু
স্বপ্ন নিরাশ্রয়ী...

উদ্‌যাপন

ভারতের স্বাধীনতা দিবস

ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় পনেরোই আগস্ট তারিখে। ১৯৪৭ সালের এই তারিখেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটেছিল। ভারত স্বাধীন হয়েছিল। এটি ভারতের জাতীয় ছুটির দিন। সারা দেশে স্থানীয় প্রশাসন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। দেশের প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় দিলিস্নর লালকেল্লায়। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পতাকা উত্তোলন করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতা ও শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পটভূমি

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটেনের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনরকম সাহায্য লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের লেবার পার্টি সরকার বুঝতে পারে, এমত পরিস্থিতিতে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা অর্থবল ব্রিটিশ সরকার ও সেনাবাহিনি হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, পঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তত বৃদ্ধি পায়। দাঙ্গা রোধে ব্রিটিশ বাহিনির অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ভীমারাও রামজি আম্বেদকর প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেন। হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি ভারতে ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে যুক্ত হয়; পঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়।

লক্ষ লক্ষ মুসলমান, শিখ ও হিন্দু শরণার্থী র‍্যাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে নিরাপদ দেশে আশ্রয় নেন। পঞ্জাবে শিখ অঞ্চলগুলি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। বাংলা ও বিহারে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি দাঙ্গার প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আড়াই থেকে পাঁচ লাখ লোক সীমান্তের দুই পারের দাঙ্গায় হতাহত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। করাচিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ এই রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ নেন। মধ্যরাতে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সূচিত হলে জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত 'নিয়তির সঙ্গে অভিসার' অভিভাষণটি প্রদানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জন্ম হয় ভারতীয় ইউনিয়নের। নতুন দিল্লিতে নেহরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। মাউন্টব্যাটেন হন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল।

উদ্‌যাপন

১৫ আগস্ট দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানটি *দূরদর্শন*সহ নানা বৈদ্যুতিন চ্যানেলের মাধ্যমে সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতেও পতাকা উত্তোলনসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ কেন্দ্রে পতাকা উত্তোলন করেন। নানা বেসরকারি সংস্থাও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্কুলক লেজেও পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই উপলক্ষে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাজপোশাক পরে শোভাযাত্রা করে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

open happiness
'Coca-Cola', 'Coke', the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
'Coca-Cola' contains no fruit. 'Coca-Cola' contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company. www.facebook.com/cocacola

ছোটগল্প

কণ্ঠজীবী

গৌর কারক

প্রতি বুধবার ধীরেন দাস ভিক্ষা করতে আমাদের পাড়ায় আসে। প্রতিটি ঘরেই দোতারা বাজিয়ে দু' লাইন চার লাইন গানের কলি শোনায়। যেসব দিন আবার কোন কোন ঘরে পুরো গানটাই গায়, সেদিন আমাদের বাড়িতে আসতে তার ন'টা-দশটা বেজে যায়।

আমাদের ঘরে দশটা নাগাদ এলে, ভীষণ রাগ হয় আমার। মন দিয়ে ওর গান শুনব, দোতারার বাজনা শুনব, না স্কুল যাবার জন্য তৈরি হব? তখন হয়তো বলে ফেলি, দাস ঠাকুর, আমাদের ঘরে আর একটু আগে আসতে পার না?

– ঠিক আছে ছোটবাবু, এবার থেকে আরও আগে আসার চেষ্টা করব, বলে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে ধীরেন দাস।

আজ বুধবার, ধীরেন দাসের আসার দিন। সকাল থেকে মনটা উশখুশ। সামনে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা। বই-খাতা খোলা আছে সামনে কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। কান খাড়া হয়ে আছে দরজার দিকে। উঠোনে বা রান্নাঘরে কোন শব্দ হলেই দৃষ্টি সরে যায় দরজার দিকে। আমাদের এখানে প্রচুর ভিখারি। প্রত্যেকেই সপ্তাহে একদিন করে নির্দিষ্ট পাড়াতে যায়। যেমন ধীরেন দাস প্রতি বুধবার আসে আমাদের এদিকের কয়েকটা পাড়াতে। শুক্রবার যায় পশ্চিম দিকের পাড়াতে। কিন্তু সোমবার সকলেই মেন রাস্তায় ভিক্ষা করে, কেউ পাড়ায় ঢোকে না। সেদিনই বোঝা যায় এখানে কত ভিখারি। এদের মধ্যে অনেকেই গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে, কেউ গানের সঙ্গে করতাল বা খোল বাজায়। দোতারা বাজায় একমাত্র ধীরেন দাসই।

ধীরেনের গান আমার খুব ভাল লাগে। যেমন মিষ্টি গলার সুর তেমনি সুন্দর দোতারা বাজানো, মনটাকে মোহিত করে দেয়। ধীরেন এলে আমার দিদি আর আমি তার সামনে বসে গান শুনি। রান্না ঘর থেকে মাও উঠে আসে এক এক দিন।

আগের দুটো বুধবার আমরা ধীরেনের গান শুনিনি। গত বুধবার ধীরেন দাস আসেনি গান শোনাতে। সেদিন স্কুলে আমি একটা সহজ অঙ্ক ভুল করে ফেলি। অঙ্কের স্যার খাতাটা নিয়ে বলেন, তুমি আজ মন দিয়ে অঙ্ক করনি।

আমাদের ঘর থেকে স্কুল পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। আজ সে পথটা দু'মিনিটে অতিক্রম করেই স্কুলে পৌঁছাই। স্কুলে তখনো গেট খোলেনি। গেটের সামনে ফাইভসি ক্লের ছেলেদের ভিড়। অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে সেদিকে। আমি তাদের মধ্যে সুভাষ, জবা, মদন, ভুবনেশ্বরদের খুঁজি। স্কুলের পোশাকে সবাইকে জবা, মদন মনে হয়।

আমি মাথা নিচু করে স্যারের কথা শুনি। জানি, এসব অঙ্ক আমার কাছে জল-ভাত, স্যারও জানেন। কিন্তু স্যার এটা জানেন না যে, অঙ্কটা ভুল হয়েছে ধীরেন দাসের জন্য। সকাল থেকে হাঁ করে বসে থেকেও ধীরেন আসেনি, স্কুলেও এসেছি দেরি করে।

তার আগের বুধবার আমরা ছিলাম না। আমার দাদুর হঠাৎ বাড়াবাড়ির খবর আসায় আমরা সবাই সোমবার মামাবাড়ি চলে যাই। দাদু একটু ভাল হতে বুধবার বিকেলে ফিরে আসি। সেখানে গিয়েও ভুলিনি ধীরেন দাসকে। ভুলিনি বুধবারটা। সকালে মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনদের জমাট আড্ডায় বলি, আজ সকালে ধীরেন দাস আসবে আমাদের ঘরে।

– ধীরেন দাস কে?

– দোতারা বাজিয়ে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে, আর মাঝে মাঝে রেডিওতে গান গায়।

– মারব থাপ্পড়, মিথ্যুক কোথাকার– বলে মামাতো দাদা ছোটন আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে থাকে– যে রেডিওতে গান গায়, সে আবার ভিক্ষা করে নাকি?

মা কাছাকছি কোথাও ছিলেন। ছোটনদার কথা শুনতে পেয়ে বলে, হ্যাঁরে ছোটন, ধীরেন দাস রেডিওতে গান গায়।

দুই.

আমাদের ঘর থেকে স্কুল পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। আজ সে পথটা দু'মিনিটে অতিক্রম করেই স্কুলে পৌঁছাই। স্কুলে তখনো গেট খোলেনি। গেটের সামনে ফাইভ-সিক্সের ছেলেদের ভিড়। অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে সেদিকে। আমি তাদের মধ্যে সুভাষ, জবা, মদন, ভুবনেশ্বরদের খুঁজি। স্কুলের পোশাকে সবাইকে জবা, মদন মনে হয়।

ক্লাসরুমে ঢুকেই ওদের বলি, সোমবার আমি টিফিনে পালাব।

– কেন রে?

– দুটো চলি-শ রেডিওতে ধীরেন দাসের গান।

– কে বলল?

– ধীরেন দাস।

জবা বলে, হ্যাঁ, সেদিন আমাদের ঘরেও বলে এসেছে।

নিমেষে মনের উৎসাহ কমে যায়। ভেবেছিলাম ধীরেন দাস শুধু আমাদের ঘরেই বলে। এখন দেখি অন্য ঘরেও বলে বেড়ায়।

পুনরায় উৎসাহ এনে বলি, তোদের ঘরে সব গানগুলো শুনিয়েছে?

জবা নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয়, কে জানে, আমি প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিলাম।

যাক, জবা তাহলে গানগুলো শোনেনি। মনের মধ্যে একটু শান্তির বাতাস খেলে যায়, আবার চনমনে হয়ে উঠি। আগের মত উদ্দীপ্ত গলায় বলি, আমাদের ঘরে ছ'টা গান গেয়ে শোনাল।

যদিও ধীরেন দাস দুটো গান পুরো শুনিয়েছে। আর দুটো গানের কয়েক কলি। এসব বন্ধুদের বলা যায় না। যে কথাটা বলেছি, তাকে আরও বাস্তব করার জন্য বলি, জানিস, ধীরেন দাস এবার লালন ফকির নামে এক বিখ্যাত লেখকের লেখা চারটে গান গেয়েছে।

– লালন ফকির কে?

– একজন বিখ্যাত গীতিকার। ওর লেখা অনেক গান আছে, কিন্তু যাকে তাকে গাইতে দেয় না।

সত্যি বলতে কি, লালন ফকির কে, সেটা আমিও জানতাম না। ধীরেন দাস যখন দিদিকে বলেছিল, এবার আমি লালন ফকিরের চারটে গান গেয়েছি। আমিও মদনের মত ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লালন ফকির কে?

ধীরেন দাস সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, উনি একজন প্রণম্য ব্যক্তি।

আমার ইচ্ছে ছিল, ধীরেন দাস ছ'টা গানই গেয়ে শোনায় আমাদের। তারপর যখন সেই গানগুলো রেডিওতে শুনব, গর্বে বুকটা ভরে যাবে।

বাস্তবে সেটা হবার নয়। ওকে আরও অনেক ঘর ঘুরতে হবে। সব ঘরের মুঠি মুঠি চাল নিয়ে ভরে উঠবে তার ঝুলি। একটা ঘরে সকাল থেকে বসে থাকলে চলে না। তবু আমাদের ঘরে আটটা-ন'টার জায়গায় প্রায় দশটায় এসেছে।

আমি ভেবেছিলাম, এ বুধবারেও ধীরেন দাস আসবে না। হয়তো শরীরটা খারাপ কিংবা বাইরে কোথাও গেছে। এই ভেবে বই-খাতা তুলে চান করতে যাব, অমনি দোতারা টুং টাং শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন তোলপাড় করে ওঠে। দোতারার সেই শব্দ মাতিয়ে দেয় মনকে, মনে হয় বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল এবার।

জয় নিতাই বলে ধীরেন দাস উঠোনে আসার আগেই, নাচতে নাচতে আমি উঠোনে আসি। ভাল করে ওকে দেখি। না শরীর ঠিক আছে তার।

– আগের বুধবার আপনি আসেননি কেন?

– সেদিন রেডিওতে আমার রেকর্ডিং ছিল।

– আপনার গান রেডিওতে হয়ে গেছে? আমার গর্বের বেলুনে কেউ যেন পিন ফুটিয়ে দেয়।

– নাগো ছোটবাবু। সোমবার দিন বাজবে। ৬টা ৪০-এ কলকাতা ক-এ। দুপুর ২টো ৪০-এ কলকাতা খ-এ। আর রাত ৯টা ৫০-এ পূর্বাঞ্চল শ্রোতাদের অনুষ্ঠানে।

তারপর দুটো গান শোনায়। একটা শোনা যাবে সকাল ৬টা ৪০-এ। আর একটা ২টো ৪০-এ। আমার খুব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল ধীরেন দাসের সেই বিখ্যাত গান–

কালো বিড়াল কে পুষেছো গয়লা পাড়াতে
বিড়াল ভাঁড় ভেঙেছে, দুধ খেয়েছে, মুখ মুছেছে কাঁথাতে।

কিন্তু ঘড়ির কাঁটা থেমে নেই। মনের কথা বলতে পারি না তাকে।

তিন.

ছোটনদা বেড়াতে আসে। আমাদের এখানে বারো মাসে তেরো পরব। তার একটা কালীপুজো। ছোটনদা আসে কালীপুজোয়, শুক্রবারে। শনিবার সকালে অন্যান্য ভিখারিরা ভিক্ষা করতে আসে।

ছোটনদা শুধোয়, হ্যাঁরে, সেই রেডিওতে গান গাওয়া ভিখিরিটা কখন আসবে ভিক্ষা করতে?

ছোটনদার কথা বলার ধরন দেখে আমার খুব রাগ হয়। ভিক্ষা করলেও ধীরেন দাস আমার প্রিয় শিল্পী। ওর গানের রেকর্ড থাকলে, আমি প্রায়ই গান শুনতে চেয়ে রেডিওতে চিঠি লিখতাম। কিন্তু মনের রাগ মনেই চেপে রাখি। বিশেষত ছোটনদার কাছে। ছোটনদা অন্য ধরনের ছেলে। লেখাপড়ায় তুখোড়। আড্ডা, গল্প সবেতেই ওস্তাদ। মামাবাড়ি গেলে আমি ওর সঙ্গ ছাড়ি না। সেই দাদা এখন আমাদের ঘরে। যতই অপ্রিয় কথা বলুক, মুখ বুজে সহ্য করতেই হয়। ওর কথার উত্তরে বলি– আজ নয়, ধীরেন দাস বুধবার আসে।

ছোটনদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, তুই ওর ঘরটা জানিস?

– না।

– ঠিক আছে। পিসিমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে বিকেলে ওর বাড়িতে যাব।

– সে তো রাত্রে।

মায়ের কাছ থেকে ছোটনদা, নিখুঁতভাবে জেনে নেয় ধীরেন দাসের ঠিকানা। আমি শুধু জানতাম ধীরেন ছোটনগরে থাকে। কিন্তু ছোটনগরের কোন গলিতে সেটা জানতাম না।

ছোট এক ফালি ঘর। মাটির দেওয়াল। পাতলা খড়ের ছাউনি। এতটুকু বারান্দা। বারান্দাটা পুরনো টালির। ছোট উঠোন। উঠোনের একপাশে তুলসীমন্দির।

একটা তেলচিটে ছেঁড়া তালাই উঠোনে পেতে শুয়ে আছে ধীরেন দাস। আমাদের দেখে উঠে বসে।

– এসো ছোটবাবু এসো, বলে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। আমার তালাই-এ বসতে সঙ্কোচ করে। আমি বসলেই ছোটনদাকেও বসতে হবে। শহুরে দাদা। কি ভাববে, কে জানে।

কিন্তু আমাকে অবাক করে ছোটনদা বসে। বলে, ভাইয়ের মুখে আপনার খুব নাম শুনেছি। তাই পরিচয় করতে এলাম।

ছোটনদার সঙ্গে যতই ঘুরি, ততই অবাক হই আমি। যেমন, গতকাল সন্ধ্যায়। ঘরে এসে ব্যাগ রেখে বলে, চল ভাই, এক চক্কর ঠাকুর দেখে আসি।

মা বলে, এইমাত্র এসেছিস। এখন একটু বোস, বিশ্রাম নে। তারপর কিছু খেয়ে বের হবি। কে শোনে কার কথা। শুধু বলে, এক গ্লাস পেন জল দাও পিসিমা। ঘুরে এসে টিফিন করব।

আমাদের এখানে প্রচুর কালীমূর্তির পুজো হয়। বড়কালী, মাইতোকালী, ঘুঘুকালী, পায়রা কালী ইত্যাদি। বড় বড় মাটির প্রতিমা। সব দেখে শুনে ছোটনদা মন্তব্য করে, তোদের এখানে কালীঠাকুরগুলো সব একই ধরনের। কোন বৈচিত্র্য নেই। ছোটনদার মুখে বৈচিত্র্য নেই শুনে মুখ শুকিয়ে যায় আমার। যে পুজোর নামডাক জেলার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। একরাতে পাঁঠাবলি হয় হাজার হাজার, সে পুজোকে এক কথায় নস্যাৎ!

কথায় কথায় কথা বাড়ে। কথার ফাঁকে সন্ধে নামে। আমি ওঠার জন্য ছটফট করছি। ছোটনদা কিন্তু গান নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যায়। লালন ফকিরের নাম কিছুদিন আগে শুনেছি। হাসন রাজা, ভবা পাগলা, সত্য সাঁই– এদের নাম এই প্রথম শুনি। এমনকী রেডিওতে বছরে ক'টা প্রোগ্রাম পায়, কত টাকা দেয় ইত্যাদি নিয়েও সমালোচনা হয়।

কথায় কথায় চলে আসি গানে। আসর বসে ছেঁড়া তালাই-এর উপরেই। ধীরেন দাসের গলায় ঝোলে দোতারা। ওর স্ত্রী বসে করতাল নিয়ে। ওদের ১০-১২ বছরের মেয়ে মাধুরী বসে হারমোনিয়াম নিয়ে। হারমোনিয়ামের প্যাঁ-নি শব্দে কানে তালা ধরে যায়। ছোটনদা বলে, ক'টা রীড নষ্ট হয়ে গেছে।

– হ্যাঁ। এবার প্রোগ্রাম পেলে সেই টাকায় সারিয়ে নেব। বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেও, ধীরেন দাসের গানে মনটা ভরে যায়। ওর স্ত্রীও ভিক্ষে করে করতাল বাজিয়ে। ধীরেন দাসের গান এতদিন শুধু দোতারা বাজিয়েই শুনেছি। আজ শুনলাম করতাল হারমোনিয়ামের সঙ্গে। নিজেকে বেশ পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে।

দুটো গান গাওয়ার পর ছোটনদা বলে, দুটো গান ভৈরবীতে গাইলেন।

– শেষেরটা মিশ্র ভৈরব।

– ঠিক ধরতে পারিনি। একটু থেমে ছোটনদা আবার বলে, আপনার হাসন রাজার কোন গান জানা আছে?

ধীরেন দাস গান ধরে,

লোকে বলে, বলে রে
ঘরবাড়ি ভাল না আমার
কি ঘর বানাইব আমি, শূন্যেরও মাঝার॥

ওর মেয়ে মাধুরীও একটা গান শোনায়। হারমোনিয়াম বাজিয়ে।

আসার পথে ছোটনদা বলে, দারুণ গলা। মেয়েটা লেগে থাকলে করে খাবে।

চার.

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর দু-তিন মাস পড়ার চাপ থাকে না। তবু প্রাইভেটে যেতে হয় সকাল সন্ধ্যে। এখন কম্পিটিশনের যুগ। পিছিয়ে গেলে, পিছিয়ে পড়তে হবে। কানের কাছে শুধু এগিয়ে চলার কথা। এগিয়ে যাচ্ছে দিদি। এগিয়ে যাচ্ছে ছোটনদা, আমাকেও এগিয়ে যেতে হবে।

পথে যেতে যেতে এক সন্ধ্যায় ধীরেন দাসের সঙ্গে দেখা।

– চল ছোটবাবু, ঘরে আসর বসাব। অতিথি এসেছে।

সেই একবার ছোটনদার সঙ্গে ওর ঘর গেছি। তারপর আর যাওয়া হয়নি। তবে যথারীতি আমাদের ঘরে গেলে ওর গান শুনি। রেডিওতে গান থাকলে শোনার চেষ্টা করি। যত বড় হচ্ছি, বইয়ের চাপ বাড়ছে। যদিও সেই চাপ সামলে গানের জন্য স্কুল, প্রাইভেট কামাই হয় না।

এখন সপ্তাহে তিনদিন সকালে, তিনদিন সন্ধ্যায় টিউশনি। আজ টিউশনি নেই। পিছুটান না থাকায় ধীরেন দাসের সঙ্গে ওর ঘরে যাই।

ঘর আগের মতই। কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। সেই উঠোন। সেই পিঁড়ে। আসর বসে পিঁড়েতে। এ আসরে ছোটনদার পরিবর্তে এক সাধুবাবা। লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি। পরনে গেরুয়া পোশাক। বয়সটা ধীরেন দাসের থেকে কিছু কম।

ধীরেন দাস দোতারা, ওর স্ত্রী করতাল, মাধুরী হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। হারমোনিয়ামের গোলমালটা আগের চেয়ে বেশি শোনায়।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, হারমোনিয়ামটা এখনো সারানো হয়নি?

ধীরেন দাস সহজভাবে উত্তর দেয়, না ছোটবাবু, এখনো সারানো হয় নাই।

মাধুরীর পরিবর্তন চোখে পড়ে। সে আগের চেয়ে আরও পরিপূর্ণ। কথা বুঝতে শিখেছে। আমার কথা শুনে লজ্জায় মুখটা নামিয়ে নেয় হারমোনিয়ামের উপর। আসর জমে ওঠে। বাড়তি পাওনা নতুন সাধুবাবার গুবগুবি। মাধুরীর গানের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে গুবগুবি বাজায় নতুন সাধুবাবা।

মাধুরী গায়;

হরিবলো হরিবলো মনরে আমার
হাসি মাখা বদনে, ছলছল নয়নে
আনন্দ কাননে চলো একবার।

গান চলাকালীন ধীরেন দাস মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, জয় ভবা পাগলা।

আসর শেষ হতে সন্ধে গড়িয়ে রাত নামে। রাতের চিন্তায় বয়সের মণিকোঠায় উকি মারে মাধুরী। আমার থেকে দু-তিন বছরের ছোট হলেও শরীরে-স্বাস্থ্যে ছাড়িয়ে গেছে আমাকে। ভাঙা হারমোনিয়াম নিয়ে গলাটাও তৈরি করেছে অপূর্ব। মনে মনে ভাবি, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ধীরেন দাস আমাদের ঘরে এসে বলবে, মাধুরীর অমুক দিন রেডিওতে গান আছে। ছোটবাবু শুনবে।

এখন আমি শুধু মাধুরীর গানই শুনতে চাই। এ কথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারি না। তাই ক'দিন পর আবার বিকেলে ধীরেন দাসের ঘরে যাই। গিয়ে শুনি, সেদিন রাতেই মাধুরীর কণ্ঠিবদল হয়ে গেছে সেই সাধুবাবার সঙ্গে।

মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন ভিড় করে। যার গান রেডিওতে, ফাংশনে শোনার জন্য মুখিয়ে ছিলাম, সেই মেয়ে এই বয়সে কণ্ঠিবদল করে ফেলল। তাও আবার প্রায় বাবার বয়সি লোকের সঙ্গে? মাধুরী কি স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে, না বাবার উপর অভিমান করে?

এসব প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করি না। যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমার শুধু এখন একটাই চিন্তা, উচ্চমাধ্যমিকে পার্সেন্টেজ।

পাঁচ.

দিদি যেদিন চন্দনদার সঙ্গে ঘর ছাড়ে, সেদিনই খুন হয় রাজীব গান্ধী। পরদিন সকাল থেকে দুই বিস্বাদের সুর একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আমাদের ঘরে। প্রতিবেশীরা এসে বাবাকে মাকে বোঝায়, নমো পাড়ায় চন্দনদাদের ঘর যেতে। যা ঘটে গেছে, সেটাকে মেনে নিতে।

শেষ পর্যন্ত বাবা-মা যায় চন্দনদাদের ঘর। ঘরে এখন আমি একা। খুনের কারণে হাট-বাজার, দোকান, স্কুল-কলেজ, এমনকী প্রাইভেটও

বন্ধ। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। দিদির বিয়ের ব্যাপারে নানাজনের কাছ থেকে কথা শুনতে হবে না।

বই নিয়ে বসে আছি ঘরে। পাশে নামানো আছে রেডিও। রেডিওতে শুধু খবর শুনছি। কীভাবে একজন আর একজনকে হত্যা করতে পারে।

হঠাৎ মাধুরীর কথা মনে পড়ে। মাধুরীকেও তো হত্যা করেছে সেই সাধুবাবা। কীভাবে হাড়জিরজিরে, চুলদাড়িসর্বস্ব একটা লোক, মেয়ের বয়সি কারো সঙ্গে কণ্ঠিবদল করা মানে তো হত্যারই নামান্তর।

বিয়ের পর মাধুরী এখানে এসেছিল কিনা খবর নিইনি ধীরেন দাসের কাছে। সত্যি কথা বলতে কি, ধীরেন দাসের উপর থেকে সেই ভালবাসাটাও উবে গেছে।

চন্দনদা চাকরি করে বাইরে। বদলির চাকরি। যেখানে এখন আছে সেখানে থেকে বদলি হয়ে যাবে অন্য জায়গায়। বদলি হবার আগে দিদি একবার মাকে যেতে বলে। বাস, ট্রেন পাল্টে মাকে আমি নিয়ে যাই দিদির বাসায়। সাজানো-গোছানো ছোট শহর। শহরের একপ্রান্তে চন্দনদার অফিস। অফিসকে কেন্দ্র করে স্টাফ কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের সামনে নানান গাছ। গাছে হাজার রকমের পাখি। আমি ঘুরে ঘুরে পাখি দেখছিলাম।

হঠাৎ দেখি মাধুরী। একটা কোয়ার্টার থেকে ভিক্ষা করে এদিকে আসছে। হাতে করতাল। কাঁধে ঝোলা। পরনে গেরুয়া কাপড়।

আমাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে একটু ধমকে দাঁড়ায়। তারপর এক মুখ শিউলি ফুলের মত হেসে কাছে আসে। বলে, ছোটবাবু, আপনি এখানে?

আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। এই কি সেই মাধুরী, যার গলা এখনো রিন্ রিন্ করে বাজে আমার কানে। রেডিও বা মাইকে লোকগীতি বাজলে, যার ছবিটা ভেসে ওঠে আমার চোখে, সেই মাধুরী অনেকদিন পর এখন আমার সামনে।

চেহারায় উন্নতি হয়েছে অনেক। কপালে রক্তচন্দনের তিলক, গেরুয়া রঙের ছটা, খুব মোহময়ী করে তুলেছে নিজেকে মাধুরী।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় আসে শরীরে এত উন্নতির সঙ্গে নিশ্চয় গলারও উন্নতি হয়েছে। অতএব গান শোনার লোভ ছাড়তে পারি না।

মাধুরীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলি, একটা গান শোনাও। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। রাস্তা ছেড়ে মাধুরী একটা গাছতলায় দাঁড়ায়। দু-দ- কী চিন্তা করে, তারপর করতাল বাজিয়ে শুরু করে।

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার মনের মাঝে আরশি নগর
এক পড়শি বসত করে।

গান চলাকালীন গাছের ডালে কয়েকটি পাখি ডেকে ওঠে। অমনি আমার মনে পড়ে হারমোনিয়ামের কথা। হারমোনিয়ামটা কি সারানো হয়েছে, না কি এখনও একটা রিড টিপলে সব রিড বেজে ওঠে?

মাধুরী গান শেষ করে বলে, বিকেলে আসুন আমাদের আশ্রমে। আরও অনেক গান শোনাব।

আশ্রমের ঠিকানা দিয়ে গেলেও যেতে মন চায় না। গান শোনার পর থেকে মনটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে। এত সুন্দর গলায় সুর, খেলে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। সে সুরকে কাজে লাগিয়ে মাধুরী শুধু ভাতের ব্যবস্থা করছে।

ছোটনদা কি ললাট লিখনও পড়তে পারে? না হলে সেদিন ওর বলা কথাগুলো পুরোপুরি সত্যি হয়ে যায় কীভাবে!

সেই সাধুবাবার উপর জমে থাকা রাগটা ক্রমশ দ্বিগুণ হয়ে এমন আকার ধারণ করে যে, ওদের খোঁজ-খবর নেওয়ার সৌজন্যবোধটুকুও আমি হারিয়ে ফেলি।

মাধুরী যেমন আমাদের এখানকার সব খবরাখবর নেয়, আমার উচিত ওদের খবর নেওয়া। কিন্তু মনের মধ্যে যে আর একটা মন বাস করে, সে আমার বশীভূত নয়। সেখানে ধীরেন দাসের দোতারার মত টুং-টাং করে বাজতে থাকে:

রোদন করো কীসের কারণে
আরোগ্য করিব আমি তোমার নন্দনে।

গৌর কারক ভারতের ছোটগল্পকার

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ আগস্ট

সবুজ বিপ্লবের জনক কৃষিবিদ এমএস স্বামীনাথনের জন্ম

০১ আগস্ট ১৯৩২	❖	বলিউড অভিনেত্রী মীনাকুমারীর জন্ম
০২ আগস্ট ১৮৬১	❖	আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়ের জন্ম
০৪ আগস্ট ১৯২৯	❖	কিশোরকুমারের জন্ম
০৭ আগস্ট ১৮৬৮	❖	প্রমথ চৌধুরীর জন্ম
০৭ আগস্ট ১৯২৫	❖	সবুজ বিপ-ব্লর জনক কৃষিবিদ এমএস স্বামীনাথনের জন্ম
০৭ আগস্ট ১৯৪১	❖	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
১১ আগস্ট ১৯০৮	❖	ক্ষুদিরামের ফাঁসি
১২ আগস্ট ১৯১৯	❖	মহাকাশবিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৮৭২	❖	ঋষি অরবিন্দের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৯২৬	❖	কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৯৪৭	❖	ভারতের স্বাধীনতা দিবস
১৫ আগস্ট ১৯৪৭	❖	অভিনেত্রী রাখি গুলজারের জন্ম
১৬ আগস্ট ১৮৮৬	❖	রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মৃত্যু
১৮ আগস্ট ১৯৩৬	❖	গীতিকার-পরিচালক গুলজারের জন্ম
২০ আগস্ট ১৯১২	❖	কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম
২০ আগস্ট ১৯৪৪	❖	রাজীব গান্ধীর জন্ম
২১ আগস্ট ১৯১২	❖	বিমল মিত্রের জন্ম
২৩ আগস্ট ১৮৯৮	❖	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
২৮ আগস্ট ১৮৫৫	❖	স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম
২৯ আগস্ট ১৯৭৬	❖	কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু
৩১ আগস্ট ১৫৬৯	❖	মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

প্রবন্ধ

ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্য দ্রষ্টব্যসমূহ

পি কে দে

খাজুরাহ মন্দির ॥ ১৯৮৬ সালে স্বীকৃত

খাজুরাহ মন্দির পরিসর বিশ্বকে দেওয়া ভারতের অদ্বিতীয় উপহার। ১৯৮৬ সালে এটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা লাভ করে। এখানে প্রস্তরে অঙ্কিত চিত্রকরের নিপুণ শিল্পশৈলী, অনবদ্য কল্পনার পূর্ণাঙ্গতার মধ্য দিয়ে আনন্দ আর ভালবাসার অনুপম প্রকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ৯৫০ ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে চান্দেলা রাজপুত রাজারা এই মন্দির পরিসর নির্মাণ করেন। এ মন্দির পরিসরে ছিল ৮৫টি মূল মন্দির। এর প্রত্যেকটিই স্থাপত্যশিল্পের অনন্য পূর্ণতার স্মারক। সময়ের গর্ভে এ মন্দির পরিসরের অনেকগুলো মন্দির এখন কেবল ইতিহাস। সময়কে অতিক্রম করে ২২টি মন্দির আজও টিকে আছে।

খাজুরাহ মন্দির পরিসরের নির্মাতারা দাবি করেন যে, তারা চন্দ্রদেবের উত্তরসূরী। এ প্রসঙ্গে একটি মজার কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। এ কিংবদন্তিটি হচ্ছে– একদিন হেমবতী নামে এক সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা একাকী বনের জলাশয়ে স্নান করছিলেন। এসময় চন্দ্রদেব তাঁকে আলিঙ্গন করেন। এতে যে শিশুর জন্ম হয়, তার নাম রাখা হয় চন্দ্রবর্মণ। চন্দ্রবর্মণ চান্দেলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বড় হয়ে শাসক হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। একদিন তিনি তাঁর মাকে স্বপ্নে দেখেন। উল্লেখ্য তাঁর মা অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। স্বপ্নে মা তাঁকে বলেন, তুমি এমন মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণ কর, যাতে সব ধরনের মানবীয় আবেগ প্রকাশিত হবে।

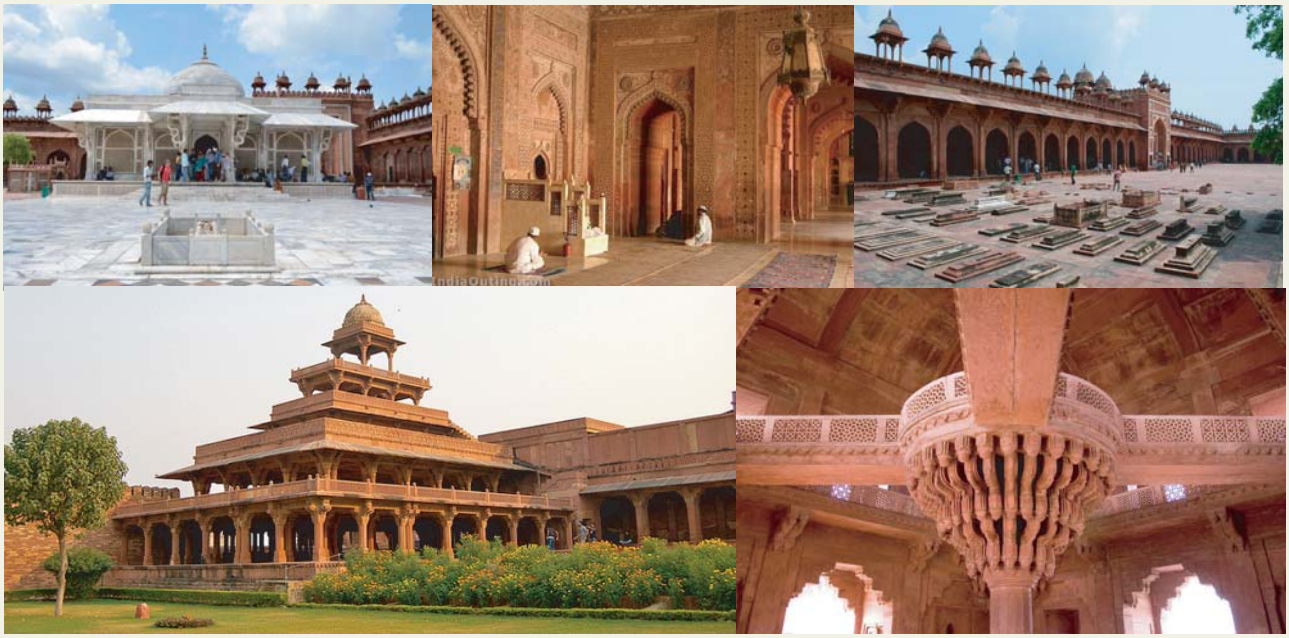

ফতেহপুর সিক্রি

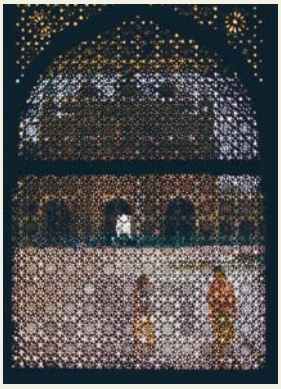

চান্দেলা রাজবংশের ক্ষয়িষ্ণুতার সঙ্গে সঙ্গে শত বছর ধরে নির্মিত মন্দিরগাত্রে খোদাইকৃত কামকলার প্রতিকৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। যেগুলো টিকে ছিল, বিংশ শতাব্দীতে সেগুলো পুনরুদ্ধার করা হয়।

মহিমান্বিত মন্দির কমপ্লেক্সের অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– কান্দারিয়া মহাদেব মন্দির, জগদম্বা লক্ষ্মণ মন্দির ও পার্শ্বনাথ (জৈন) মন্দির।

ফতেহপুর সিক্রি ॥ ১৯৮৬ সালে স্বীকৃত

১৯৮৬ সালে ফতেহপুর সিক্রি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এটি লাল পাথরে নির্মিত। সম্রাট আকবর চারশো বছর আগে আগ্রা থেকে ৩৭ কিলোমিটার পশ্চিমে এটি নির্মাণ করেন। আকবরের সন্তান না থাকায়, তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী থাকবে না– এ সমস্যা উত্তরণের জন্য তিনি আধ্যাত্মিক সাধক শেখ সেলিম চিশতির কাছে যান। সিক্রি নামক গ্রামে বসবাসরত এ সাধকের কাছে আকবর সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। তার প্রার্থনা পূরণ হয়। তিনি অচিরেই পুত্র সন্তান লাভ করেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে সাধকের নামানুসারে আকবর ছেলের নাম রাখেন সেলিম। সেলিমই পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর নামে খ্যাত হন। আকবর সিক্রিতে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে সাধকের কাছাকাছি অবস্থান করতে চাইলেন। এভাবে রাজধানী আগ্রার মতই সিক্রিও যৌথ রাজধানী হিসেবে পরিগণিত হল।

জাঠ ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে তিনি নতুন রাজধানীর নামকরণ করলেন ফতেহপুর সিক্রি। নব গঠিত রাজধানী প্রস্তর নির্মিত চমৎকার খোদাইয়ের কাজ ও নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীতে অলংকৃত করা হল কিন্তু প্রচণ্ড পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ায় মাত্র ১৪ বছর পরেই রাজধানী পরিত্যক্ত হয়। মার্বেল পাথরে নির্মিত সাধক চিশতির সমাধিসহ অনেক স্থাপত্যকর্মই এখনও অক্ষত রয়েছে। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সকলের ইচ্ছা পূরণের মাজারে পরিণত হয়েছে চিশতির সমাধিটি। অন্যান্য স্থাপত্যকলার নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেওয়ান্নই খাস, দেওয়ান্নই আম, পাঁচমহল, রানী মহল, বুল ন্দ দরওয়াজা ইত্যাদি।

হামপি ॥ ১৯৮৬ সালে স্বীকৃত

কর্নাটক রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত হামপি মধ্যভারতের

হামপি

গোয়া

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে হামপি ১৯৮৬ সালে স্বীকৃতি পায়। একদিকে খরস্রোতা নদী তুঙ্গভদ্রা ও তিনদিকে পর্বতমালা হামপিকে ঘিরে রেখেছে।

ধারণা করা হয়, ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে হরিহর না মে দুই ভাই বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এরা দুই ভাই হুক্ক ও বুক্ক নামেও পরিচিত। এরা হয়শালা রাজার কর্মকর্তা ছিলেন। হয়শালা বংশের পতনের পর তুঙ্গভদ্রার পাড়ে এই দুইভাই স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর চারপাশ ঘিরে ছিল মুসলিম রাজ্য। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বিজয়নগর সাফল্যের সঙ্গে বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করে টিকে ছিল কিন্তু ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন রাজা রাম রাও সম্মিলিত মুসলিম শক্তির কাজে পরাজিত হন। আক্রমণকারীরা সুন্দর নগরীটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। যাবতীয় মন্দির ও প্রসাদ ধ্বংস করে ফেলে। বিধ্বস্ত হামপি এখনও পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়।

সম্রাট কৃষ্ণদেবের আমলে হামপি ছিল গৌরবের শীর্ষে। ঐসময় বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক বিজয়নগরে এসেছেন। তাঁরা হামপি নগরের সৌন্দর্যের কথা তাদের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। পর্তুগিজ পর্যটক ডোমিঙ্গো পায়েস (১৫২০ খ্রিস্টাব্দে) হামপিকে প্রাচ্যের রোম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ নগরীর যেসব স্মৃতিচিহ্ন আজও পর্যটকদের আকর্ষণ করে, সেগুলো হচ্ছে হাজার রাম, বিঠাল মন্দির, পদ্ম মহল, প্রভু উগ্র নরসিংহ মূর্তি, বিরূপাক্ষ মন্দির ইত্যাদি।

গোয়া ॥ ১৯৮৬ সালে স্বীকৃত

রৌদ্রকরোজ্জ্বল গোয়ার বর্ণিল ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে একগুচ্ছ প্রাচীন ক্যাথলিক গির্জা। পর্তুগিজরা এগুলো নির্মাণ করেছিল। ইংরেজদের আগমনের আড়াইশো বছর পূর্ব থেকে গোয়া পর্তুগিজ কলোনি ছিল। ইংরেজ বিদায়ের একযুগ পর পর্যন্তও এটি পর্তুগিজ কলোনিই ছিল। গির্জা ও মিশনারিসমৃদ্ধ গোয়া ১৯৮৬ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা লাভ করে। গৌরবের অনেক কিছু কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও এখনও দর্শনীয় অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বোম যিশু গির্জা, সে ক্যাথেড্রাল, বিখ্যাত স্বর্ণের ঘণ্টা ইত্যাদি। প্রাচীন গোয়ার সেন্ট ক্যাথরিন গির্জাটি খুবই প্রসিদ্ধ। ১৫১০ সালে এখানেই আফোনসো ডি আলবুকার্ক আদিল শাহকে পরাজিত করে। এছাড়া 'শান্তা মনিকা' আশ্রম নয়নাভিরাম।

বৃহদেশ্বর মন্দির ॥ ১৯৮৭ সালে স্বীকৃত

১৯৮৭ বৃহদেশ্বর মন্দির ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদায় আসীন হয়। চমৎকার স্থাপত্য শিল্পের

বৃহদেশ্বর মন্দির

পট্টকদল মন্দির

জন্য তামিলনাড়ু প্রদেশের তানজাভুরে অবস্থিত এই মন্দিরটি পৃথিবী বিখ্যাত। বিখ্যাত চোল রাজের শাসনকালে (৯৮৫১০১৪ খ্রিস্টাব্দ) মন্দিরটি নির্মিত হয়। ৬৫ মিটার (২১৬ ফুট) উঁচু বৃহদেশ্বর মন্দিরটি পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির। ১৫৫ মিটার (৫০০ ফুট) দৈর্ঘ্য ও ৭৫ মিটার (২৫০ ফুট) প্রস্থ বিশিষ্ট মন্দিরটিতে চমৎকার ভাস্কর্য ও নিপুণ শিল্পসুষমামণ্ডিত গ্যালারি ও করিডোর বিদ্যমান। এই মন্দিরে রয়েছে ৬৫ মিটার (২০০ ফুট) উঁচু স্বর্ণাবৃত বৃহদাকার গম্বুজ। এ মন্দিরের নির্মাণকাঠামো এমনভাবে করা হয়েছে যে, কখনও ভিত্তিমূলে এর ছায়া পড়ে না। এখানে রয়েছে লিঙ্গম নামে বিশাল প্রস্তর খ-, যা প্রভু শিবের প্রতিমূর্তি। এই প্রতিমূর্তিটি আকারে ভারতবর্ষে বৃহত্তম। পাশেই রয়েছে শিবের প্রিয় শিষ্য নন্দীর বৃহৎ প্রতিমূর্তি। এনসাইক্লোপেডিয়ার মতে, বৃহদেশ্বর মন্দিরটি ভারতের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির।

পট্টদকল মন্দির ॥ ১৯৮৭ সালে স্বীকৃত

১৯৮৭ সালে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদায় আসীন হয় কর্নাটকের পট্টদকল মন্দির। চমৎকার ভাস্কর্য পরিবেষ্টিত উত্তর কর্নাটকের বাদামির কাছে প্রাচীন চালুক্য রাজধানী পট্টদকল বিশাল মন্দির কমপ্লেক্সের জন্য বিখ্যাত। চালুক্য রাজবংশের রাজারা এই মন্দিরগুলো নির্মাণ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে প্রভু বিরূপাক্ষ, সঙ্গমেশ্বর ও মল্লকার্জুনের মন্দির। কাঞ্চীর শক্তিশালী শাসক বংশ পল্লবদের বিরুদ্ধে জয়লাভের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে রানী লোকমহাদেবী বীরূপাক্ষ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মালপ্রভা নদীর ধারে নির্মিত মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৭৬ মিটার ও প্রস্থ ৩৬ মিটার। মন্দিরের সামনে ২.৬ মিটার উঁচু নন্দী ও বিরূপাক্ষ (শিব)র মূর্তি বিরল স্থাপতশিল্পের নিদর্শন। এছাড়া মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী সত্যিই দৃষ্টিনন্দন।

এলিফান্টা গুহা মন্দির ॥ ১৯৮৭ সালে স্বীকৃত

মুম্বইয়ের 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া' ও এ্যাপলো বন্দর পোতাশ্রয় থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে সমুদ্রে অবস্থিত একটি দ্বীপ হচ্ছে এলিফ্যান্টা। প্রাচীনকালে এটি খারাপুরি বা কেল্লার নগরী হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সেসময় গুহা মন্দিরের জন্য বিখ্যাত এ দ্বীপটি রাষ্ট্রকূট রাজাদের উপাসনার নির্জন স্থান হিসেবে বিবেচিত হত। পরবর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ দস্যুরা এ দ্বীপটি দখল করে

এলিফান্টা গুহা মন্দির

সুন্দরবন

ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা এটির নাম পরিবর্তন করে ‘এলিফ্যান্টা দ্বীপ’ রাখে। বিশাল আকৃতির প্রস্তর নির্মিত একটি হাতির মূর্তি থাকার কারণে এ নামকরণ করা হয়। ৪৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ দ্বীপে পাহাড় কেটে চারটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এগুলো নির্মাণের প্রকৃত সময়কাল জানা যায়নি। কারণ পর্তুগিজরা এ সংক্রান্ত সমস্ত এপিটাফ ধ্বংস করে ফেলেছিল। এ দ্বীপের প্রধান গুহায় সজ্জিত বৃহৎ ভাস্কর্যসমূহ আওরঙ্গাবাদের ইলোরা গুহার ভাস্কর্যসমূহের মতই জৌলুস ও আড়ম্বরপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহেশ মূর্তি বা ত্রিমূর্তি ভাস্কর্য। প্রভু শিবের তিন মাথা প্রতিনিধিত্ব করে– ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও মহেশ্বর মহাবিশ্বের বিনাশকর্তা। এছাড়া, অন্যান্য ভাস্কর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিল্পাবতীর বিবাহ, শিবের তা-ব নৃত্য এবং কৈলাশ পর্বতে শিল্পাবর্তী আসীন অবস্থায় রাক্ষসরাজ রাবণের কৈলাশ পর্বত উৎপাটনের চেষ্টা ইত্যাদি। ১৯৮৭ সালে এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান ও বাঘ সংরক্ষণ
১৯৮৭ সালে স্বীকৃত

কলকাতা শহর থেকে ঠিক ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে পৃথিবীর বৃহত্তর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায় গড়ে ওঠা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ ঘিরে সুন্দরবন বিস্তৃত। ভারতে এই ব-দ্বীপের ৪২৬৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা অবস্থিত। এই অংশ সমগ্র সুন্দরবনের এক তৃতীয়াংশ। এই সুবিস্তৃত জাতীয় উদ্যানের কেন্দ্রভাগে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বসবাস। গোটা সুন্দরবন জুড়ে রয়েছে বিচিত্র ফল, ফুল ও বৃক্ষের সমাবেশ। কেবলমাত্র নদীপথেই সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব। এখানকার বন্য জীবজন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, বানর, ডলফিন, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও পাখি। কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে সুন্দরবনের প্রধান প্রবেশদ্বারে পৌঁছতে একঘণ্টা সময় লাগে। ভ্রমণের বাকি অংশ নদীপথে সম্পন্ন করতে হয়।

নন্দা দেবী জাতীয় উদ্যান
১৯৮৮ সালে স্বীকৃত

গাড়োয়াল হিমালয়ের নন্দা দেবী ও আরও কিছু সুউচ্চ পর্বতশিখর পরিবেষ্টন করে নন্দা দেবী জাতীয় উদ্যানের অবস্থান। বিচিত্র বৃক্ষ ও অসংখ্য জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ এই উদ্যান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্বের অন্যতম বৈচিত্র্যময় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে। নন্দা দেবী পর্বতশৃঙ্গ ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হিমালয় চূড়া। ৭৮১৭ মিটার উঁচু এ পর্বতশৃঙ্গ উত্তরাঞ্চল প্রদেশের চামোলি অঞ্চলে অবস্থিত। হৃষীকেশ থেকে ২৫৭ কিমি দূরে জোশিমঠের কাছে অবস্থিত লতা গ্রামের মধ্য দিয়ে নন্দা

নন্দা দেবী জাতীয় উদ্যান

সাঁচি

দেবী উদ্যানে পৌঁছনো যায়। 'পুষ্প উপত্যকা' নামে খ্যাত নন্দা দেবী জাতীয় উদ্যানে ৬৩০ বর্গ কিমি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। সমগ্র এলাকাটি বছরের ছয় মাস বরফে ঢাকা থাকে।

মহাদেব শিবের স্ত্রী পার্বতী দেবীর আবাসভূমি হিসেবে নন্দা দেবী শৃঙ্গ যুগে যুগে বন্দিত হয়ে এসেছে। দেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদনের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলের পাহাড়ী মানুষেরা বিভিন্ন উৎসব ও মেলার আয়োজন করে। অপূর্ব পুষ্পশোভিত নয়নাভিরাম এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে হৃষীগঙ্গার সর্পিলাকার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। এ জাতীয় উদ্যানটি খুরবিশিষ্ট অসংখ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য বিখ্যাত। এদের মধ্যে বরাল, হিমালয়ের তাহর, গোরাল, মাস্ক হরিণ অন্যতম।

মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে চিতাবাঘ, কালো ভল্লুক ও তুষার চিতা। এছাড়া রয়েছে স্বর্ণ ঈগল, ট্রাগোপান ইত্যাদি জীবজন্তু। এখানে নীল পপি, ব্রহ্মকমল ছাড়াও অসংখ্য বিরল প্রজাতির ফুলের গাছ উদ্যানের শোভা বর্ধন করেছে।

সাঁচি ॥ ১৯৮৯ সালে স্বীকৃত

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে প্রায় ৪৫ কিমি দূরে অবস্থিত সাঁচি একটি উল্লেখযোগ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। পর্বতবেষ্টিত ও বৃক্ষশোভিত সাঁচি বৌদ্ধযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। বৌদ্ধ সভ্যতার পাদপীঠ হিসেবে সাঁচিকে গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন কুষাণ শাসকেরা। পরে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক কাষ্ঠনির্মিত শিল্পকর্ম সরিয়ে অনবদ্য শিল্পমণ্ডিত হলুদ পাথরের স্থাপত্যশিল্প প্রবর্তন করেন। বুদ্ধদেবের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সাঁচিতে অনন্য স্থাপত্য শিল্পসমৃদ্ধ আটটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। এই গম্বুজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ১৬.৫ মিটার উঁচু ও ৩৭ মিটার ব্যাসার্ধবিশিষ্ট। এখান থেকেই অশোকের পুত্র যুবরাজ মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারে শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলেন। এখানে সন্ন্যাসিনীদের জন্য রানীর প্রচেষ্টায় একটি আশ্রমও নির্মিত হয়েছে। বুদ্ধের শিক্ষা ও তীর্থস্থান হিসেবে সাঁচির মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে সাঁচিতে অবস্থিত গম্বুজ, মন্দির, আশ্রম, চমৎকার প্রবেশদ্বার। নিপুণ ভাস্কর্যের পাশাপাশি রৌপ্যকাররাও নিখুঁত শিল্পকর্ম উপস্থাপন করতে তাদের সাধ্যের সর্বোত্তম চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন শিল্পকর্মে জীবনের উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলোর প্রতিকৃতি আর বুদ্ধের বিভিন্ন মন্ত্র চিত্রিত করা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেব সাঁচিতে তাণ্ডব চালিয়ে এর ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত করেন। ১৮১৮ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক জন মার্শাল বনভূমির মাঝে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সাঁচিকে আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে সাঁচির গৌরবময় ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

হুমায়ুনের সমাধি

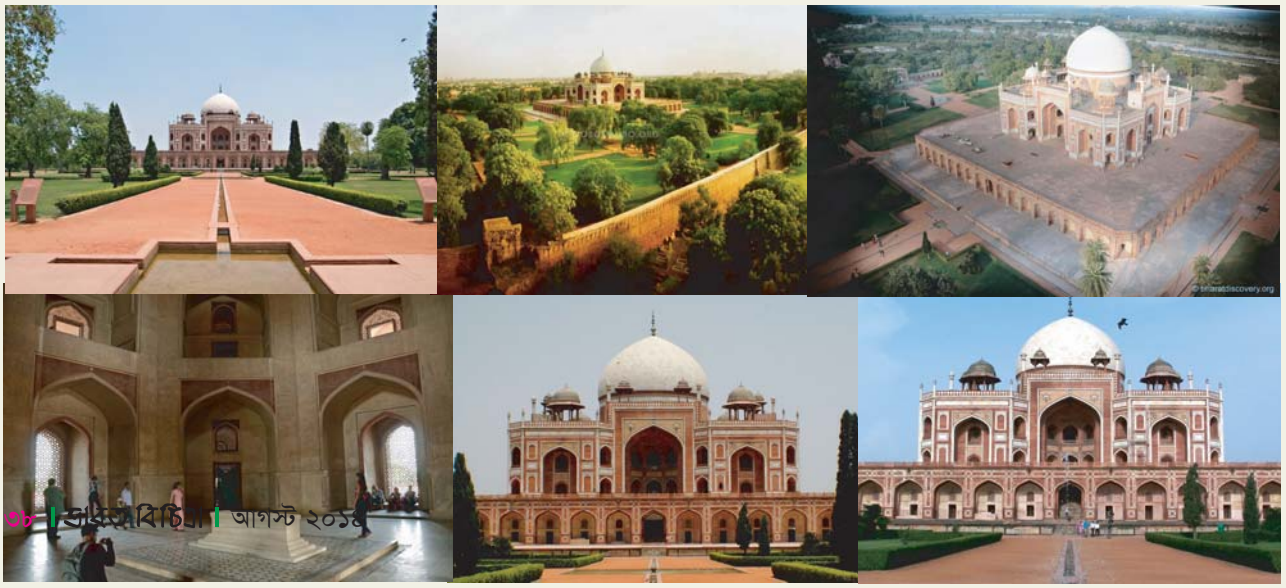

কুতুব মিনার

হুমায়ুনের সমাধি ॥ ১৯৯৩ সালে স্বীকৃত

পুরান কেল্লার দিনপনাহ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি দিল্লিমথুরা সড় কে অবস্থিত। জাঁকালো এই সমাধি লাল পাথরে নির্মিত। এর নির্মাণশৈলীতে রয়েছে সাদা ও কালো মার্বেল পাথরের অপূর্ব সন্নিবেশ। এতে রয়েছে উঁচু ধনুকের ন্যায় বেষ্টনী ও জোড়া গম্বুজ। ভারতে মুঘল স্থাপত্যের প্রথম যুগান্তকারী নিদর্শন এই সমাধি। এটি আগ্রায় অবস্থিত তাজমহলের অগ্রদূত। হুমায়ুনের মৃত্যুর নয় বছর পরে ১৫৬৫ সালে তার বিধবাপত্নী (প্রথম) হাজি বেগম এটির নির্মাণকাজ শুরু করেন। এটির ডিজাইনার ছিলেন ফার্সি স্থাপত্যবিদ মিসাক মির্জা গিয়াস। পরবর্তীকালে এই আড়ম্বরপূর্ণ উদ্যান্ন সমাধিতে আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুঘলকে সমাহিত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– হাজি বেগম ও সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ দারাশিকো। বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে ইংরেজ সৈন্যদের বিতাড়িত করতে এখানেই শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ও তার তিন ছেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে লেফটেন্যান্ট হডসন তিন যুবরাজকে গুলি করে হত্যা করেন এবং বাহাদুর শাহকে বন্দী করে বর্মায় নির্বাসনে পাঠান।

কুতুব মিনার কমপ্লেক্স ॥ ১৯৯৩এ স্বীকৃত

দক্ষিণ দিল্লিতে অবস্থিত সুউচ্চ কুতুব মিনার ভারতবর্ষে আফগান শাসনের অন্যতম স্মারক। মধ্যযুগের বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এই মিনার সম্পর্কে বলেছিলেন, পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যের বিষয়। বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে ১১৯৩ সালে কুতুবউদ্দিন আইবেক কুতুব মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পার্শ্ববর্তী কুয়াত্তউল্লইসলাম মসজিদ নির্মাণ করা হয় মুসল্লিদের নামাজ পড়ার জন্য। ৭৩ মিটার উঁচু ১৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট মিনারটি নির্মাণের কাজ শেষ করেন কুতুবউদ্দিনের জামাতা ও পরবর্তী শাসক ইলতুৎমিশ। পাঁচতলাবিশিষ্ট মিনারটির প্রতি তলাতেই গোলাকার ব্যালকনি রয়েছে। প্রথম তিনটি তলা লাল পাথরে নির্মিত, পরবর্তী দু'টি তলা সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত। ১৩৬৮ সালে সুলতান ফিরোজ শাহ মিনারটির উপরে একটি গম্বুজ সংযোজন করেন কিন্তু ১৮০৩ সালে ভূমিকম্পে এই গম্বুজটি পড়ে যায়। আটশো বছরের বেশি সময় ধরে নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অজস্র

দার্জিলিঙের টয় ট্রেন

খোদাইকর্মসমৃদ্ধ মিনারটি টিকে থাকলেও সামান্য কাত হয়ে পড়েছে। কথিত আছে, মিনারটি নাকি আদতে নির্মাণ করেছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। তিনি ছিলেন দিল্লির শেষ হিন্দু রাজা। দূরের যমুনা নদী যাতে তার মেয়ে দেখতে পায়, এজন্য এই মিনারটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন। চমৎকার ক্যালিগ্রাফিসমৃদ্ধ ইলতুৎমিশের সমাধি মিনারের পাশেই অবস্থিত। ১৩১১ সালে আলাউদ্দিন খিলজি 'আলাই দরওয়াজা' নামে মিনারটির আরেকটি প্রবেশদ্বার নির্মাণ করেন। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হচ্ছে সাত মিটার উঁচু বিখ্যাত লৌহনির্মিত স্তম্ভ। চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের শাসক মহান গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের স্মরণে এই লৌহ স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

দার্জিলিঙের টয় ট্রেন ॥ ১৯৯৯ সালে স্বীকৃত

পৃথিবীর সর্বোত্তম গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদন ছাড়াও দার্জিলিং আরেকটি কারণে বিশ্বে সুপরিচিত। তা হচ্ছে, শিলিগুড়ির সমতলভূমি থেকে দার্জিলিঙের হিমালয়ের বনাচ্ছাদিত পথে টয় ট্রেন ভ্রমণ। ১৮৮১ সালে এই ট্রেনপথ নির্মিত হয়। এরকম পার্বত্যপথে নির্মিত যাত্রীবাহী ট্রেনপথের ইতিহাসে এটিই পৃথিবীতে প্রথম। ২১৩৪ মিটার উঁচু আঁকাবাঁকা পার্বত্যপথে এই ট্রেনপথটি নির্মিত। ৮৫৯৮ মিটার উঁচু পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘাসহ হিমালয়ের অনেক সুউচ্চ শৃঙ্গ দেখার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হন এইসব রেলযাত্রীরা। দশ ঘণ্টা দীর্ঘ ট্রেনযাত্রা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুতগামী ট্রেনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনন্য এই টয় ট্রেন ১৯৯৯ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হয়।

অনুবাদ **ভাস্কর পোদ্দার**
পি কে দে ভারতের প্রখ্যাত আলোকচিত্রী
সূত্র **ভারত প্রসঙ্গ**

● *ভারত বিচিত্রা* জানুয়ারি, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর ২০০৬ সংখ্যাত্রয় থেকে গৃহীত ও পুনর্মুদ্রিত

প্রবন্ধ

চিরকালের নজরুল

প্রাণেশকুমার চৌধুরী

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যে বাংলাদেশ এ শতকে এগিয়ে চলেছে সেই বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলামের মূল্যায়ন অপরিহার্য। যদিও রক্তক্ষয়ী এক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তবুও বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ হয়েছিল নজরুলের কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে। আমরা যে বাঙালি– তার মূল চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম। ব্রিটিশ ভারতে নজরুল জন্ম নিয়ে যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিলেন, সেই বিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসাবে জন্ম নিয়েছিল ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। আমরা বাঙালিরা যে ভাষায় সমৃদ্ধ, ঐতিহ্যে মহীয়ান ও চেতনায় স্বাধীন তা নজরুলের কবিতা, গান, গল্প-প্রবন্ধ এবং উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের জন্মের পর আমরা কবি নজরুলকে জাতীয় কবি হিসেবে গ্রহণ করেছি। নজরুল বাঙালির ঘরে ঘরে পূজিত ও সমাদৃত। যে শিশু সদ্য কথা বলতে শিখেছে তার কাছে যেমন আদরণীয় নজরুল, তেমনি আদরণীয় তিনি পক্ককেশ বৃদ্ধের কাছেও। শিশু যখন আবৃত্তি করে 'ভোর হল দোর খোল খুকুমণি ওঠরে' অথবা 'কাঠবেড়ালি কাঠবেড়ালি, পেয়ারা তুমি খাও' তখন সেই শিশু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আবার বৃদ্ধের কাছে তাঁর আবেদন হচ্ছে 'মসজিদেরই পাশে মোরে কবর দিও ভাই'।

স্কুলগামী যে ছাত্র-ছাত্রী বিশ্বরহস্য জানবার জন্য উৎসাহ বোধ করে তখন সে প্রাণভরে পড়ে এবং আবৃত্তি করে 'থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে/দেখবো এবার জগৎটাকে'। সমাজসচেতন মানুষ যখন জীবনসংগ্রামে ব্রতী হয় তখন সমাজের অন্যায়-অবিচারে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'জনগণে যারা জোঁকসম শুষে তারে মহাজন কয়/ সন্তানসম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়'– এত আমাদের সমাজের চিত্র; বৈষম্যেরই প্রমাণ। তাই তো কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই/ নহে কিছু মহীয়ান'। সমাজের অন্যায়-অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ফরিয়াদ জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে জবাব চেয়েছেন, 'উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান/ মাগে প্রতিকার সন্তান তব'। তবে প্রতিকার না পেলেও তিনি নীরবে অন্যায় সহ্য করবার পাত্র নন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তাই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত/ সেই দিন হব শান্ত,/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/ অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না'। শাসকের শক্তি প্রবল, শাসন কঠোর, শাসকেরা মানুষকে কারারুদ্ধ করতে পারবে না কিন্তু নিজের অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে যারা শাসকের রোষানলে পড়ে, কারারুদ্ধ হয় তাদের জন্য নজরুলের আহ্বান, 'কারার এ লৌহ কপাট/ ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট'। নজরুলের এই আহ্বান কোন বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী কিংবা সমাজের জন্য নয়। এই আহ্বান চিরকালের বঞ্চিত, শোষিত এবং নির্যাতিতের জন্য।

মানুষমাত্রই আবেগপ্রবণ। সমাজের সব ধরনের ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে নজরুলের কবিতা ও গানে। রোমান্টিকতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে তাঁর কিছু কবিতায়, 'মোর পিয়া হবে এস রানী/ দেব খোঁপায় তারার ফুল'। এই গানে প্রিয়াকে সাজাবার যে অমূল্য অলঙ্কার তৈরি করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বিরল। 'এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল' একি সুন্দর অভিব্যক্তি! কি আশ্চর্য ভাববিলাস। আবার যদি বলি, 'আমায় চোখ ইশারায় ডাক দিল হায়/ কে গো দরদী'। প্রেমিকপ্রাণের আকুল নিবেদন– 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়/ সেকি মোর অপরাধ'। এ হল চিরকালের প্রেমিক-হৃদয়ের সৌন্দর্যস্তুতি। কিন্তু আনন্দ বিলাসের কবি হলে কি হবে? তাঁর জীবনেও আছে দুঃখ। তারই পরিণতিতে মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে কবি করুণ কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন– 'ঘুমিয়ে আছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি'। মানুষ বাঁচতে চায় তার কর্মের ভিতর দিয়ে, কিন্তু নজরুল তার কাব্যখ্যাতি সম্বন্ধে খুব একটা আশা পোষণ করতেন না, তাই তিনি বলেছেন– 'পরোয়া করি না বাঁচি কিনা মরি/ যুগের হুজুগ কেটে গেলে/ মাথার উপর জ্বলিছেন রবি/ রয়েছে সোনার শত ছেলে'। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বাংলার ভাবিকালের কবিদের জন্য তাঁর গভীর আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। নজরুল জীবনবাদী ও আশাবাদী ছিলেন। তাই তো তৎকালীন ভারতের দুর্দশা দেখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– 'দুঃখ কি ভাই/ হারানো ভারতে আবার সুদিন আসিবে ফিরে/ গলিত শুষ্ক এ মরু-ভূ পুন গুলিস্তাঁ হয়ে হাসিবে ধীরে'। জীবনের এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে নজরুল কথা বলেননি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কালীমন্দিরে যে গানটি সবসময় গাওয়া হয়ে থাকে– 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'– এর রচনাকার কবি নজরুল ইসলাম। আবার একই সুরে ধ্বনিত হয়েছে– 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' অথবা 'রমজানের ওই রোজার শেষে/ এলো খুশীর ঈদ' কিংবা 'তৌফিক দাও খোদা ইসলামে'। কি সুন্দর সমন্বয়! কি অপূব অনুভূতি! মনে হয় চণ্ডিদাসের সেই গান– 'শুন হে মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। নজরুল মানুষের কবি, মানবতার কবি। তাঁর সাহিত্য কালজয়ী, তিনি বাঙালি হয়েও সমগ্র বিশ্বের কবি। তিনি জীবনকে খণ্ডক্ষুদ্র করে দেখেননি।

প্রাণেশকুমার চৌধুরী
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

বকুল নেই।

এই সত্য এখন এ বাড়ির চারদিকে। কখনো তুমুল আলোচনা করে সবাই রাতের ভাত খাওয়ার পরে বারান্দায় বসে। কিংবা দিনজুড়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনায় বকুলের স্মৃতি নাড়াচাড়া করে। সবারই মনে হয় এই বাড়ির সবার দিন গড়াতে শুরু করেছে নতুনভাবে। আগে একরকম ছিল, এখন অন্যরকম। বিষাদ এবং আনন্দ দুটোই সমানতালে যাচ্ছে। শুধু জয়নুলের মনে হয় মেয়েটি ভাল থাকতে পারবে তো? শান্তিতে থাকবে তো? নাকি কাজের জায়গায় খাটতে খাটতে ওর শরীর অর্ধেক হয়ে যাবে? জয়নুলের বোধে ভালমন্দ দুই চিন্তাই একরকম থাকে। তবে বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। ভাবলে শরীর কেমন কুঁকড়ে যায়। মনে হয় কোথাও কিছু হয়েছে। শরীরের টানটান ভাব মিইয়ে গেছে।

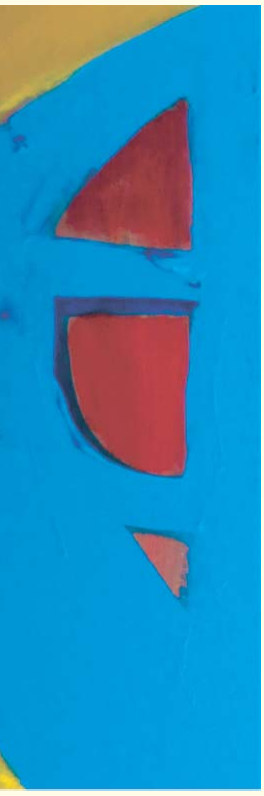

ইদানীং বকুলের জন্মের সময়ের কথা মনে হয় জয়নুলের।

মেয়ের জন্মের দিন ও বাড়িতে ছিল না। ধান নিয়ে হাটে গিয়েছিল। ভাল দাম পেয়ে ভেবেছিল, এবার বোধহয় ওর ছেলে হবে। ধান বিক্রির টাকা দিয়ে ধুমধাম করে আকিকা করবে। অনেকদিন পর বাড়িতে উৎসব হবে।

বাবা মারা যাওয়ার পরে এ বাড়িতে বড় ধরনের উৎসব হয়নি। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে জয়নুল দুই কেজি জিলাপি কিনেছিল। রাশিদুন জিলাপি খেতে ভালবাসে। আজ ও নিজের হাতে রাশিদুনের মুখে জিলাপি তুলে দেবে। বিয়ের পর পর যখন ও হাটে যেত রাশিদুন ওর গায়ের জামা হাতে তুলে দেওয়ার সময় বলত, বাজার করে পয়সা থাকলে জিলাপি কিনবে। আমার সামনে জিলাপি আর ভাত দিয়ে যদি বলা হয় কোনটা খাবে? আমি বলব জিলাপি খাব।

হা-হা করে হাসত জয়নুল। হাসতে হাসতে রাশিদুনকে জড়িয়ে ধরে বলত, তাহলে একটা জিলাপির দোকান দেই।

না, না তাহলে জিলাপি খাওয়ার মজা থাকবে না।

জিলাপি খাওয়াটাই তো মজা। কোথা থেকে এল তা দেখার দরকার কি!

না সেটাও মজা। কোন ময়রার বাড়িতে আমার বিয়ে হলে, আমি জিলাপি খাওয়া ছেড়ে দিতাম।

আবারও হাহা ক রে হেসেছিল জয়নুল।

ধান বিক্রি করার দিন হাট থেকে ফিরে বিকাল বেলা বকুলের জন্মের খবর পেয়েছিল জয়নুল। খুশি হয়ে বলেছিল, মেয়ে হয়েছে! আলাহ্‌র মেহেরবানী।

মেয়েটা তোর মত হয়েছে। জয়নুলের মা বারান্দায় বসে কুপির আলোয় কাজল বানাতে বানাতে বলেছিল। যে মেয়ের চেহারা বাপের মত হয় সে মেয়ে কপালী মেয়ে হয়। ভাগ্য নিয়ে জন্মায়।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, একথা বলবেন না আম্মা। যে মেয়ে মায়ের মত হবে তাহলে তার ভাগ্য কি ভাল হয় না? সে কি কপালী মেয়ে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ কপালী মেয়ে তো। তার ভাগ্যও ভাল হয়।

আপনি বাপের কথা বলবেন না আম্মা। আপনার বৌয়ের মন খারাপ হবে।

ঠিক বলেছিস।

আমি কি মেয়েটাকে দেখতে পারব?

হাট থেকে এসে মেয়ে দেখা যায় না। গোসল করে নে। পরিষ্কার লুঙ্গি-গেঞ্জি পর।

মায়ের কথায় হাসে জয়নুল। ভাবে রাশিদুন ওর মাকে একদম বশ করে ফেলেছে। নিজের ছেলের চেয়ে ছেলের বউয়ের পক্ষে বেশি। ভাল– জয়নুল মাথা নাড়ে। সম্পর্কের সুস্থতা ওকে স্বস্তি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে রাশিদুনের কাছে যাবে। বলবে, বিদেশে তোমার মেয়ে ভাল আছে। কিন্তু কীভাবে যাবে? ও গিয়ে কি সেই বটগাছের নিচে বসে থাকবে? রাশিদুনের অপেক্ষায় বসে থাকা? যদি রাশিদুন এই পথে কোন প্রসবের কারণে যায়? কিংবা রাশিদুনের যদি অন্য কাজ থাকে? সেই মেয়েটিকে দেখতে যায়, যাকে মেয়েটির বাবা এসিড খাইয়েছিল?

জয়নুল দু'হাতে চোখের জল মোছে। একটু আগে শিউলি তাকে দুধে ভেজানো চিতই পিঠা দিয়ে গিয়েছিল। জয়নুল তা খায়নি।

বাজান পিঠা খান!

পিঠা? জিলাপি নাই মা?

আপনিতো বাজারে যান নাই। জিলাপি কোথায় পাব?

আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। পিঠাই দাও।

আপনার কি হয়েছে বাজান?

কিছু না, কিছু না মা।

জয়নুল সামনে রাখা পিঠার বাটিটা তুলে দিয়ে খেতে শুরু করে। শিউলি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকায়। বুঝতে পারে ওর সঙ্গে কথা বলার আগে মানুষটি কোন ভাবনায় ছিল। এখনও সেই ঘোরের মধ্যে আছে। তাকে তার মত থাকতে দেওয়া দরকার। শিউলি নিজের কাজে যায়। আজকে অনেক কাপড় ধোওয়ার চিন্তা করেছে ও। বিছানার চাদর, মশারি থেকে সবকিছু।

বাড়িতে পাঁচটি মেয়ে ছিল। একটি নেই। এটা সইতে সইতে মাস দুয়েক পার হয়ে যায়।

এখন আশ্বিন মাস।

উঠোনের কোণায় লাগান শিউলি গাছে ফুল ফুটেছে। গাছের নিচে সাদা ফুলে ছেয়ে আছে। কমলা রঙের বোঁটাটা সেই সাদার মধ্যে বিদ্যুতের চমকের মত লাগছে শিউলির কাছে। ও বুঝতে পারে না যে কেন এমন একটি উপমা ওর মনে এল। ফুলের বোঁটা তো মাটিতে পড়ে আছে। বিদ্যুতের মত ঝলকে বিলীন হয়ে যায় না। তাহলে? ও ভাবল, আসলে ওর মন খারাপ। শিউলি ফুল ফুটলেই বকুল দুচারপাঁচটা হাতের মুঠিতে ভরে এনে ওর হাতের তালুতে দিয়ে বলত, নাও তোমার ফুল তোমাকেই দিলাম। তুমি নিজেই একটা ফুল।

শিউলি ফুলের গন্ধ টেনে বলত, আমাদের বাড়িতে বকুল ফুলের গাছ নাই। তাহলে ফুল কুড়িয়ে আমিও তোকে দিতাম রে বকুল।

দু'বোনের হাসিতে বাড়ি মেতে উঠত। বকুলের যাওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি মন খারাপ শিউলির। স্কুলে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সময় ভাল কাটে। বাড়িতে ফেরার পথ ওকে কষ্ট দেয়। বাড়িতে ফিরলে উঠোন ওকে কষ্ট দেয়। স্কুল থেকে ফিরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

বকুল যাওয়ার পরে সবচেয়ে উৎফুল- হাস্নুহেনা। ধরে নিয়েছে, এবার ওর বাবলার সঙ্গে ঢাকায় যাওয়া হবে। গার্মেন্টসে কাজ করবে। গ্রামে শুয়েব সে দিন কাটানোর মানে নেই। ভালও লাগছে না। চেঞ্জ দরকার। শহরে গেলে জীবনটা নিজের মত করে কাটাবে।

তবে খুশিটা ও মুখে ছড়ায় না।

বাড়ির পরিবেশ খুশি ছড়ানোর মত নয়। বিশেষ করে বাবা আর বড় বোনের জন্য। তারা এখনও বকুলের যাওয়া সইতে পারছে না। চম্পা আর পদ্ম খুশিতে আছে। সরাসরি বলে, গেছে ভাল করেছে। আমরা সবাই তো একে একে যাব। একদিন বাবা চুপ করে মরে যাবে। আর এই বাড়ির খুঁটি হবে বড় বোন। আমরা বেড়াতে আসব। কেউ যদি বিধবা হই তাহলে থাকতে আসব।

তিন বোন নিজেদের আসরে এমন কথাই বলে। খোঁচা দেয় হাস্নুহেনাকে। চম্পা বলে, বুবু তুমি এইবার নিজের পথ দেখ। আমাদের পথ আটকে রেখ না।

আমি তোদের পথ আটকাব কোন দুঃখে? তোদের যা খুশি তোরা তাই কর। তোদের সামনে আমি কোন পাথর না যে ঠেলে সরাতে পারবি না।

ওরে বাবা, তুমি দেখছি পাথরের মতই কথা বলছ! আমরা এতকিছু ভেবে বলিনি। আমরা চাই তোমার একটা কিছু হোক।

তা তো হবেই। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে।

হাহা হাসি তে ভেঙে পড়ে তিনজনে।

হাসতে হাসতে পদ্ম বলে, এই বাড়িতে তুমি হলে ভবের পাগল। তোমাকে মুন্সী বয়াতী বিয়ে করলে মন্দ হয় না।

কি বললি? হাস্নুহেনা চোখ পাকায়।

না, না, ঠিক বলিনি। ওই দিন আমি তোমাকে বাবলা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

তাতে কি হয়েছে? তোরাও তো কতজনের সঙ্গে কথা বলিস।

তুমি যেন একটু কেমন করে কথা বলেছ।

কেমন করে মানে?

এই একটু গায়ে পড়া ভাব ছিল।

চম্পা! হাস্নুহেনা আঙুল তুলে শাসায়। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

মার খাবি আমার হাতে।

বাবলা ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কিছু ঘটনা ঘটলে খারাপ কি? ভালই তো।

তোদের পথ পরিষ্কার হয়, না?

বলতে পার, সেটাও সত্যি কথা।

আবার হাহা হাসি তে তিনজন গড়িয়ে পড়ে। তিনজনই অনুভব করে হাসতে ভাল লাগছে। ভাল লাগার প্রচ্ছন্ন উলাস ওদের ভেতরে কলকল করে। তিনজনেই ভাবে, সামনেই কোন ঘটনা ঘটবে, যে ঘটনায় ওদের সংসারে পরিবর্তন আসবে। চম্পা আস্তে করে ডাকে, হাস্নুবু?

বল। কি বলবি?

বাবলা ভাইকে কি তোমার ভাল লাগে?

লাগে।

তোমার হাত ধরতে চাইলে তুমি হাত ধরবে?

ধরব।

ধরবে? ভয় করবে না?

ভয় করবে কেন? বাবলা ভাই তো গুণ্ডা না। শহর থেকে প্যান্টশার্ট পরে আসে মনে হয় বড় অফিসার। কি সুন্দর যে লাগে! মনে হয় শুধু তাকিয়েই থাকি।

তোমার তো হয়ে গেছে দেখছি। হুররে–

চম্পা আর পদ্ম একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

এই চুপ, আস্তে।

আশেপাশে কেউ নাই।

বাতাসেরও কান আছে।

থাকুক। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তুমি এগোও।

হাস্নুহেনা দুই বোনের দুই হাত চেপে ধরে। অনুভবের মগ্নতায় ওর ভেতরে বিরামহীন জলের স্রোত বয়ে যায়। ও নিজেকে সংযত করতে পারে না। চম্পা আর পদ্ম ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, হাস্নুহেনাকে এত সুন্দরী আর কখনো মনে হয়নি। আজও সত্যি সত্যি এক ডানাকাটা পরী।

একসময় এই আনন্দের সময় শেষ হয়। ওরা বাড়ির বাইরে গাছের নিচে বসেছিল। ওদের হাতে তেঁতুলমাখা নো বাটি ছিল। তিনজনে আয়েশ করে কথার ফাঁকে ফাঁকে তেঁতুলের বাটি শেষ করেছে। শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখানো বলে ঝাল ছিল খুব। তিনজনের জিহ্বা সেই ঝাঁঝে জ্বলতে শুরু করে। আনন্দমুহূর্তের উত্তেজনায় সেটা টের পায়নি ওরা। এখন ওদের চোখ বেয়ে পানি গড়ায়। দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে পদ্ম বলে, এ আমাদের আনন্দের চোখের পানি। কবে যে হাস্নুবুকে বিদায় দিতে হবে সেজন্য।

বেশ বেশ। চম্পা হাততালি দেয়।

তখন বাড়ির দরজা থেকে ওদের ডাকে শিউলি। ওরা কাছে আসতেই অভিযোগ করে, আমার কথা কি তোদের একটুও মনে নাই?

তুমি আমাদের হিসাবের খাতা বুবু। তোমার কথা মনে না রাখলে আমাদের হাবিয়া দোজখেও জায়গা হবে না।

আমি হিসাবের খাতা কেন?

আমাদের ভবিষ্যৎ তোমার কাছে জমা রেখেছি না আমরা! আমাদের মাথার ওপর আর কে আছে? ওদের কথা শুনে থমকে যায় শিউলি। ও কি এতটাই বয়সী হয়ে গেল? কেমন করে সময় পার হয়ে গেল? বিয়ে করে শ্বশুরবড়িতে চলে গেলে ওরা এমন করে ভাবত না। তাহলে বাবলার সঙ্গে ঘর বাঁধাই কি ঠিক ছিল? বাবলা কি এখন রাজি হবে? শোনা যায় ও গ্রামে এসেছে কিন্তু শিউলির সঙ্গে দেখা হয়নি। ওর মন খারাপ। জীবন কি ভুলের সাগরে ডুবে গেল? না থাক। এসব নিয়ে আার ভাবার দরকার নেই। যে জীবন ও চায়নি সে জীবন সেভাবেই চলুক। শুধু হাসিখুশি থাকুক জীবনে। বেঁচে থাকা স্বস্তির হোক। ভাল লাগার হোক। একটু আগে ওর ছোট তিন বোনের হাসির শব্দ শুনেছে। ওরা কেন হেসেছে তা জানার ইচ্ছা হয়। পরক্ষণে নিজেকে শাসন করে। জেনে হবে কি? ওদেরটুকু ওদের কাছেই থাকুক। শিউলির জীবন প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে না অন্যের কাছ থেকে। যা কিছু মীমাংসা নিজের সঙ্গেই হবে।

বুবু তোমার কি মন খারাপ?

মোটেই না। মন খারাপ হবে কেন? আজ স্কুলেও ভাল কেটেছে। ক্লাশ ওয়ানের ছেলেমেয়েদের গল্প শুনিয়েছি। ওদের কাছ থেকেও গল্প শুনতে চেয়েছি। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আপা আমি একটা গল্প বলব। আমি বললাম, বল। সবাই তোমার গল্প শুনবে। ও বলল, একটি পাখি ছিল। পাখির বাবামা ছিল না। একদিন ও গা ছের বাসা থেকে ফুড়ুৎ করে আকাশে উড়ে গেল। আমার গল্পটি শেষ হল।

সবাই মিলে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভরিয়ে ফেলল বাড়ি এবং চারজনই খেয়াল করল, মুন্সী বয়াতীকে নিয়ে ওদের বাবা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়াতীর একতারা বাজছে টুনটুন করে– বয়াতী গলা ছেড়ে একটা লাইন গাইল– ও আমার সোনার পাখি কোথায় গেলে পাব তোরে–। গান গাইতে গাইতে ঢুকল উঠোনে।

তখন চারদিকে স্নিগ্ধ বিকেল। নরম আলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

পদ্ম দৌড়ে গিয়ে জয়নুলের হাত ধরে।

বাজান আপনি কোথায় ছিলেন? দুপুরের ভাত খেতে আসেননি।

বয়াতী আমাকে ধরে নিয়ে গেল। ভাত খাওয়াল। আমাকে গান শোনাল।

তাহলে আপনি অনেক সুখে ছিলেন বাজান?

সুখ? হ্যাঁ, সুখেই তো ছিলাম। কি বল বয়াতী?

বয়াতী মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ে। তারপর একতারা বাজিয়ে গান করে, সুখের সন্ধান করে আমার মন– ও আমার মনরে–।

বয়াতী থামলে মেয়েরা হাততালি দেয়।

বয়াতী বলে, আমার পিয়াস লেগেছে। কে আমাকে পানি দেবে?

আমরা সবাই দেব।

চার বোন চার গ্লাস পানি আনে। বয়াতী প্রথমে শিউলির হাত থেকে গ্লাস নেয়। পরে হাস্নুহেনার গ্লাস। সেই গ্লাস শেষ করে বলে, তোমাদেরটা পরে খাব। রেখে দাও।

জয়নুল আর বয়াতীকে দুটো মোড়া এনে দেয় চম্পা। দু'জনে মোড়ায় বসে। পদ্ম জিজ্ঞেস করে, বাজান আপনাকে চাচা কি দিয়ে ভাত খাইয়েছে?

বেগুন ভর্তা আর ডাল।

জয়নুল ভাবে, মানুষ কি করে মানুষকে এত আচ্ছন্ন করতে পারে? গানের আলাদা যাদু আছে– যদি সেই গান কানের ভেতর দিয়ে বুকে ছড়ায় এবং বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে শরীরের সবখানে পৌঁছে যায়। জয়নুল পলকহীন তাকিয়ে থাকে বয়াতীর দিকে। বয়াতী একটার পর একটা গান গায়। নিজের ভেতরে ডুবে গিয়ে গান গায়। যেন এখনই গান গাইবার সবচেয়ে ভাল সময়। নাকি বয়াতীর মন আজ আনন্দে ভরে আছে?

পদ্ম হাসতে হাসতে বলে, মেহমানকে কেউ বুঝি এভাবে ভাত দেয়? মাছমাংস থাক বে না?

বয়াতী তো মাছমাংস খায় না রে মা।

জয়নুল আমার বন্ধু মা গো। ও আমার মেহমান না। আমি যা খাই ও তাই খেয়েছে।

ঠিক বলেছেন চাচা। আজ রাতে আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন। কি রাঁধব?

নিরামিষ। ঘরে যা আছে তাই করো।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

এখন গান হবে। তোমরা বস মা।

চার বোন চারদিকে বসে। শিউলি রান্নাঘরের দরজার উপরে। পদ্ম একটি মোড়া এনে বাবার পাশে। বাকি দু'জন ঘরের বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে। বয়াতীর দরাজ কণ্ঠস্বরে ভরে ওঠে বাড়ি। ও আমার মুখের নাইয়া– মন পবনে পাল উড়াইয়ে দে–। সুরের খেলায় মুগ্ধ হয়ে সবাই তাকিয়ে থাকে বয়াতীর দিকে। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ওরা।

জয়নুল ভাবে, মানুষ কি করে মানুষকে এত আচ্ছন্ন করতে পারে? গানের আলাদা যাদু আছে– যদি সেই গান কানের ভেতর দিয়ে বুকে ছড়ায় এবং বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে শরীরের সবখানে পৌঁছে যায়। জয়নুল পলকহীন তাকিয়ে থাকে বয়াতীর দিকে। বয়াতী একটার পর একটা গান গায়। নিজের ভেতরে ডুবে গিয়ে গান গায়। যেন এখনই গান গাইবার সবচেয়ে ভাল সময়। নাকি বয়াতীর মন আজ আনন্দে ভরে আছে? নাকি ভক্তির রসে ডুবে গেছে? জয়নুলের হিসাব মেলে না। শুধু বোঝে মানুষের কোন কোন সময়ে এমন হয়। সবার মাঝে থেকেও সবার বাইরে চলে যায়। যেমন জয়নুলের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাও এমন। এত বছর পরও ও তো রাশিদুনকে নিয়ে নিমগ্ন সময় কাটায়। তখন ওর অন্যকিছু মনে থাকে না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই তাকে বয়াতীর সঙ্গে এক করে দেয়। জয়নুল মুহূর্তে ভেবে সিদ্ধান্তে আসে যে, স্মৃতি মানুষের বড় বন্ধু। ভক্তিও। ভক্তিতে ডুবে গেলে দুঃখ ভোলা যায় না। বয়াতীর মত বন্ধুরা দুঃখের স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়। একসময় গান শেষ হয়। একতারার টুংটাং ধ্বনি বাড়ির বাতাসে মিশিয়ে দেয় বয়াতী।

বিকেল শেষ হয়। দিনের আলো ফুরোয়।

চারবোন উঠে কাজে যায়। বারান্দায় বসে থাকা দু'জন বয়সী মানুষের জন্য মুড়ি আর পাটালি গুড় নিয়ে আসে হাসুহেনা। বয়াতীর গান ওকে অভিভূত করেছে বেশি। গানের সঙ্গে প্রেমের ভাবনা আছে এমন অনুভব নিয়ে ও রান্নাঘরে আসে। বলে, পটল আমি ভাজব। নকশা করে পটল কাটব।

হঠাৎ এমন শখ? নকশা করবি?

মায়ের কাছ থেকে শিখে এসেছি। আজ একজন মেহমান খাবে। পটলটা রোজকার মত কাটব না। পটলের গায়ে বঁটি দিয়ে ফাঁক ফাঁক রেখা করব।

বেশ তো ভাল হবে। টুকরি থেকে পটলগুলো নিয়ে নে। কাটতে বস।

পদ্ম বলে, আমি আলু ভর্তা বানাব। শুকনো মরিচ আর পেঁয়াজ তেলে ভেজে বানালে তোমরা মাংসের স্বাদ পাবে।

চম্পা ওর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলে, তাই নাকি। তুমিতো দেখছি যাদুকর। নাকি ডাইনি?

খবরদার খারাপ কথা বলবে না।

তাহলে তুমি আলু ভর্তায় মাংসের স্বাদ আনবে কিভাবে?

আরে বাবা, এটা তো তোমাদের সঙ্গে রসিকতা।

নাকি মিথ্যা কথা?

শিউলি ধমক দিয়ে বলে, চম্পা থাম। বাজে কথা বলিস না। তুই কি করবি বল?

ঢেঁড়স ভাজব।

ভালই হয়েছে। আমি ভাত আর ডাল রাঁধব।

হাসুহেনা মাথা উঁচিয়ে বলে, পেট ভরার খাবার তুমিই রাঁধবে। আমরা যদি কিছু নাও করি তাহলেও বাবা আর চাচার পেট ভরবে ভাত ডাল খেয়ে। মনের সুখে ঘুমাতে পারবে। খিদের জন্য ঘুম ভাঙবে না। এজন্যই তো বলি তুমি আমাদের হিসাবের খাতা।

তোর মতলব কি রে হাসনু?

হাসুহেনা কথার উত্তর দেয় না। মুখে হাসি ছড়িয়ে বঁটির ওপর মাথা নামায়। গোটা পটল খাঁজ খাঁজ করে কাটতে শুরু করে। চম্পা আর পদ্ম হাততালি দিয়ে বলে, বোধহয় এই বাড়িতে একটা কিছু ঘটবে।

শিউলি বিস্মিত হয়ে বলে, তাই নাকি? কি ঘটবে?

জানি না। অপেক্ষা করতে হবে।

শিউলি কথা বাড়ায় না। দুই চুলোতে ভাত আর ডাল বসায়। শুকনো কাঠ ঠেলে দেয় চুলোয়। দাউদাউ জ্বলে আগুন। আগুনের আভায় স্নিগ্ধ দেখায় চারপাশ। যে কুপিটা ঘরে জ্বলছে সেদিকে তাকিয়ে শিউলি বিষণ্ন হয়ে যায়।

রাত বাড়ে। নীরব হয়ে যায় বাড়ি। সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

শুধু ঘুম আসে না হাসুহেনার।

মাথার মধ্যে বাবলার চিন্তা। ভাবে, প্রেম কি এমনই? বয়াতীর গানের মত? হাসুহেনা অন্ধকারে চারদিকে তাকায়। কোথাও ইঁদুর বোধহয় খুটখুট করছে, নাকি অন্যকিছু? চৌকির নিচে কিংবা ঘরের বেড়ার ধারে ইঁদুরই হবে। হাসুহেনা এপাশওপাশ ক রে।

শুনতে পায় শিউলির কণ্ঠ, তোর কি হয়েছে হাসু?

হাসুহেনা সাড়া দেয় না। এই মধ্যরাতে ওর যদি কিছু হয় তাহলে শিউলির জিজ্ঞেস করার দরকার কি? নাকি করবে? ও বুঝতে পারে কবে কোথাও শোনা গানের একটি লাইন এখন এই ঘরে শোঁ-শোঁ শব্দে বইছে, মনপবনের নাইয়া রে বাতাসে উড়াইয়া দে পীরিতের জ্বালা– গাঙ্গে থাকুক পূর্ণিমার জোয়ার। ও গানের স্পর্শে মাখামাখি করে নিজেকে। অতীতবর্তমান এক হয়ে যায়। যেন সামনে একটি অনন্ত সমুদ্র। ওই সাগর পাড়ি দিয়ে কূলে ওঠার জন্য ওর দু'চোখ ভরে ঘুম নামে।

সকালে ঘুম ভাঙলে দেখতে পায় বারান্দার বসে আছে শিউলি। ওর দিকে তাকায় কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে। শিউলির চোখে এমন দৃষ্টি ও কখনো দেখেনি। শিউলি জিজ্ঞেস করে, রাতে তোর কি হয়েছিল হাসু?

আমার মনে হচ্ছিল আমি বুঝি ডুবে যাচ্ছি। তাই ভয়ে কথা বলতে পারিনি।

তারপর কি হল?

আর কিছু জানি না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠিকমত ঘুম হলে মানুষের চেহারা খুব সুন্দর হয়। তোকে খুব সুন্দর লাগছে।

আজ আমাকে যে দেখবে সে আমাকে সুন্দর বলবে?

কার সঙ্গে তোর দেখা হবে?

জানি না।

> বাবলা যাই বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে ধুম করে শব্দ হয়েছিল হাসুহেনার। পরে বুঝেছিল, ওটা ভাললাগার শব্দ। বাবলাকে যতটা পথ পর্যন্ত দেখা গেছে ততটা পর্যন্ত ওর দৃষ্টি বাবলার পিঠের ওপর ছিল। আজও তেমন করেই তাকিয়ে থাকবে যদি বাবলাকে আসতে দেখা যায়। মুখোমুখি হলে বলবে– কি বলবে? না, ভেবে শেষ করতে পারে না।

আজ আমার স্কুলে অনেক কাজ আছে। তুই রান্নাঘর সামলাবি। চম্পা আর পদ্মর স্কুলে স্পোর্টস আছে।

আমি সব করতে পারব।

ঘুম পাবে না তো তোর?

পাবে।

পাবে? কেন?

যদি কেউ গান গায়। বয়াতী চাচার মত কেউ না। অন্য কেউ।

বুঝেছি। তোর মনে কেউ বাসা বেঁধেছে। কে বলবি?

জানি না। না জানলে কেমন করে বলব?

কথা বলতে বলতে উঠোনে নেমে যায় হাসুহেনা। পেছন ফিরে শিউলিকে দেখে না ও। শিউলির কথা ওর বিরক্তি বাড়ায়। কলতলায় এসে দেখে চম্পা আর পদ্ম হাতমুখ ধুয়ে নিচ্ছে।

চম্পা বলে, কি রাঁধবি হাসুবু? আজ পদ্ম তো দৌড়ে ফার্স্ট হবে আর প্রাইজ নিয়ে বাড়ি আসবে।

এমন তো সব বছরই প্রাইজ আনে পদ্ম।

তুই রাঁধবি কি?

ঘোড়ার ডিম।

ওরে বাব্বা। মেজাজ চড়ে আছে কেন?

বাজানকে বলবি রসগোল্লা কিনতে। মিষ্টি না হলে প্রাইজের দাম থাকে না।

হাসুহেনা জোরে জোরে টিউবওয়েল চেপে বালতি ভরে। দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে নেয়। রান্নাঘরে এসে থালায় থালায় পান্তাভাত সাজায়। ডিম ভাজি করে। ভাবে, একটু পরে বাড়ি পুরো খালি হয়ে যাবে। বাবা বাজারে গেলে ওর কোন কাজ থাকবে না। হাসুহেনা নিজের ভেতর ফিরে আসে। খানিকটুকু আশা, বাড়ির বাইরে বসে থাকলে যদি বাবলাকে দেখা যায় কোথাও?

সময়ের সঙ্গে পালস্না দেয় মন। হাসুহেনা বাঁকবদলের সূত্র খোঁজে। বুকের ভেতর সাহস তড়পায়– পেতেই হবে। সেই হবে ভালবাসার মানুষ। তারপর ঘরের। ঢাকায় যেতেই হবে। কাজ করবেই। বাসাবাড়ির কাজ না। গার্মেন্টে ঢুকতে হবে। সেজন্য বাবলার সাহায্য দরকার। ওতো বাবলাকে পছন্দ করে। বাবলা কি ওকে পছন্দ করবে না? হাসুহেনা আশায় বুক বাঁধে।

সকালের প্রহর শেষ হতে থাকে।

হাসুহেনা রাস্তার দিকে তাকায়। তাকিয়েই থাকে। অস্থির লাগে। মানুষটা কি আজ ঘর থেকে বের হয়নি? প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিন বলেছিল, এবারে গ্রামে এসেছে বিয়ে করার জন্য। মা খুব তাগাদা দিচ্ছে।

ও বলেছিল, শহরের মেয়ে পছন্দ না?

বুড়াকাল গ্রামে থাকব তো সেজন্য নিজের গ্রামের মেয়ে হলেই ভাল।

খুক করে হেসেছিল ও।

হাসছ যে, হাসির কথা বলেছি নাকি?

না, না ঠিক কথা বলেছেন। এমনি এমনি হাসলাম। গ্রামের কোন মেয়ে পছন্দ হয়েছে?

এখনও হয়নি। দেখি কি করি।

আমাদের বাড়িতে আসবেন বাবলা ভাই।

চাচার সঙ্গে দেখা করতে যাব একদিন। যাই।

বাবলা যাই বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে ধুম করে শব্দ হয়েছিল হাসুহেনার। পরে বুঝেছিল, ওটা ভাললাগার শব্দ। বাবলাকে যতটা পথ পর্যন্ত দেখা গেছে ততটা পর্যন্ত ওর দৃষ্টি বাবলার পিঠের ওপর ছিল। আজও তেমন করেই তাকিয়ে থাকবে যদি বাবলাকে আসতে দেখা যায়। মুখোমুখি হলে বলবে– কি বলবে? না, ভেবে শেষ করতে পারে না।

অপেক্ষার প্রহর বুঝি শেষ হয়ে যায়।

উঠে আসবে আসবে করছে এমন সময় দূর থেকে বাবাকে দেখতে পায়। দুই হাতে বাজারের ঝোলা। সঙ্গে হেঁটে আসছে আর একজন। কে? বাবলা ভাই। খুশিতে লাফিয়ে ওঠে হাসুহেনা। উত্তেজনা ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। এগিয়ে আসছে প্রিয় দু'জন মানুষ।

কাছে এলে জয়নুল বলে, আমার মা রান্না করবে। তুমি খেয়ে যাও বাবা।

না, চাচা আমার কাজ আছে। আজ যাই।

থাকেন না বাবলা ভাই।

কি রান্না করবে হাসু?

পুঁইশাক আর চিংড়ি মাছ। আমি নিজে পুঁইয়ের চারা লাগিয়েছি। অনেক বড় হয়েছে। তাজা শাক রাঁধব!

আমি আর একদিন আসব।

আর একদিন?

ম্লান হয়ে যায় হাসুহেনার মুখ! জয়নুল বাজারের ঝোলা নিয়ে ভেতরে চলে গেছে।

মন খারাপ করলে?

হাসুহেনা ঘাড় কাত করে বলে, হ্যাঁ।

কাল আসব। যখন বাড়িতে কেউ থাকবে না। আজ যাই।

হাসুহেনা হাতে মৃদু চাপ দিয়ে চলে যায় বাবলা।

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হাসুহেনা। ভাবে, ওকে কিছু বলতেই হল না। ওর বলার কোন কথা নেই। এক মুহূর্তে ওর সব ভাবনা শেষ হয়ে যায়। হাসুহেনা নিজের হাতের তালু মেলে ধরে সামনে। বাবলা এখানে ছোঁয়া রেখে গিয়েছে। কথা দিয়ে সবকিছু হয় না। একটুখানি ছোঁয়াও কথা হয়ে যায়।

ও একছুটে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখতে পায় জয়নুল রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাজান কি বাজার এনেছেন?

কাছে আয় মা।

ও কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই জয়নুল ওর মাথায় হাত রাখে।

কি হয়েছে বাজান?

বাবলা তোকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে আমার কাছে।

বিয়ে?

হ্যাঁ মা, ও এবারই বিয়ে করে ঢাকায় ফিরবে। তোকেও নিয়ে যাবে।

হাসুহেনা আবারও বোকার মত বলে, বিয়ে!

বাবার মুখের দিকে তাকালে দেখতে পায় বাবার মুখে মৃদু হাসি। ও বুঝে যায় বাবলার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ওর বাবা।

ও কি বলবে বুঝতে না পেরে ঘনঘন উচ্চারণ করে, বাজান– বাজান– বাজান–

হাজার হাজার বাজান শব্দ উড়ে বেড়ায় বাড়ির ওপর।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

সন্তোষ গুপ্ত
উল্টো হাওয়ার পন্থী

প্রিয়তোষ গুপ্ত

শেষ পাতা

স্কেচ: কালিদাস কর্মকার

সন্তোষ গুপ্তের জন্মের দশকে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে বরিশাল ছিল উত্তাল। অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যু এবং গান্ধীজীর নীতি পরিবর্তনের ফলে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। অন্যদিকে 'বান্ধব সমিতি'র মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল অনুশীলন সমিতির কাজ। স্বদেশী স্কুল গড়ে উঠেছে চারদিকে। গ্রামে গ্রামে স্বদেশী চরকার শব্দ। এরই মধ্যে ১৯২৫ সালের ৯ জানুয়ারি ঝালকাঠির রুনসী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সন্তোষ গুপ্ত।

সন্তোষ গুপ্তের রাজনীতিতে প্রথম পাঠ ইংরেজির শিক্ষক দেবকুমার চক্রবর্তীর কাছে। নিজে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদী নাৎসীবাদী হিটলারের ঈপ্সিত লক্ষ্য, জাপানের আগ্রাসন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের পাঠ দিতেন। অন্য দুই শিক্ষক শৈলেশ চক্রবর্তী এবং অনুশীলন পার্টির সুরেশ্বর চক্রবর্তীও মাঝে মাঝে রাজনীতির কথা বলতেন। সোভিয়েত বিপ্লবের কথাও সন্তোষ গুপ্ত প্রথম শোনেন দেবকুমারের মুখে। আরেক শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন এম এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল পার্টির নেতা।

সপ্তম শ্রেণিতে উঠে মনু অর্থাৎ সন্তোষ যেতে শুরু করে ২৬ জানুয়ারির স্বাধীনতা দিবসের মিছিলে। ১৯৩০ থেকেই কংগ্রেসের উদ্যোগে এ দিবস পালিত হত। শ্লোগান দেয় স্বাধীনতার পক্ষে এবং জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে। স্কুলের এক সভায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটা বক্তৃতাও দেয়। শুরু হয় বিপ্লবীরাজনীতিক স ন্তোষ গুপ্তের গড়ে ওঠা।

১৯৪৭এ উপমহা দেশ বিভক্ত হয়ে গেল। বাংলা এবং পঞ্জাব ভাগ হল। পুবের বাঙালি হিন্দুরা চলল পশ্চিমের দিকে; পশ্চিমের বাঙালি মুসলমানরা পাড়ি দিল পূর্ব বাংলায়। সে পরিস্থিতিতে সন্তোষ গুপ্তর কলকাতা ছাড়ার কোন কারণ বা যুক্তি ছিল না কিন্তু ভারতে থাকবেন না পাকিস্তানে যাবেন– এ অপশন দেওয়ার সময় তিনি একটি ব্যতিক্রমী কাজ করলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিলেন। আত্মীয় স্বজনরা এজন্য খুব রাগারাগি করলেন কিন্তু তিনি বললেন, '... এদেশ, দেশের মাটি, আলো বাতাস আমার আত্মার খোরাক। মাতৃভূমি ছাড়া পাপ। অত বড় হিপোক্রেসি আমি করতে পারি না।' তখন কমিউনিস্ট পার্টির অনেক ত্যাগী নেতাও এদেশে থাকা নিরাপদ মনে করেননি। এই মনোবৃত্তির জন্যই তাঁর বন্ধুরা তাঁকে 'উল্টো হাওয়ার পন্থী' বলে আখ্যায়িত করতেন।

চাকরির পাশাপাশি চলল পার্টির কাজ। ১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি রণদীভের নেতৃত্বে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' শ্লোগান তুলে তেলেঙ্গানার পথ ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার নীতিতে কাজ শুরু করে। পূর্ববঙ্গেও পার্টি একই নীতি অনুসরণ করে। এর ফলে পার্টির ওপর সরকারি নির্যাতন তীব্রতর হয়। নেতৃস্থানীয় পার্টিসভ্যরা আত্মগোপন করেন। বেশ কিছু কর্মী জেলখানায় যান। আর সেই জেলে চাকরি করেই সন্তোষ গুপ্ত চালিয়ে যান পার্টির কাজ।

তবে বন্দি হিসেবে জেলখানায় যেতেও বেশিদিন লাগেনি। সন্তোষ গুপ্তের তাঁতীবাজারের বাসা কমিউনিস্ট পার্টির আস্তানা। ১৯৪৯এর বড়দি নের বন্ধে প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে জেলা নেতৃত্বের বৈঠক বসেছে। প্রাদেশিক নেতা কমরেড আলতাফ আলী ছাড়াও ছিলেন স্বেচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে আসা সরদার ফজলুল করিম, নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক নেতা অনিল মুখার্জি, ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, মুন্সীগঞ্জের কৃষক নেতা অভয় চ্যাটার্জি, রেলশ্রমিক নেতা আবদুল বারী, ক্ষেতমজুর মনু মিয়া, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র কমিউনিস্ট নেতা তকীয়ুল্লাহ। দুপুরের খাবারের পর বিশ্রামরত কমিউনিস্টদের আশ্রয়কেন্দ্র বাড়িটি পুলিশ ঘিরে ফেলে। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ পালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কিছু কাজ হয়নি।

আই জি প্রিজন্সের ব্যক্তিগত সহকারি সন্তোষ গুপ্ত গ্রেপ্তার! যে গেটে তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, উল্টো গেটেই তাঁর অফিস। জেলখানায় এতে এক ভিন্নমাত্রার চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, বিভ্রান্ত হন স্বয়ং আই জি প্রিজন্স আমীর হোসেন খান। অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সন্তোষ, তুমিও এর মধ্যে আছ? তোমাকে ভুল করে ধরে এনেছে। আমি তোমার রিলিজের চেষ্টা করছি' কিন্তু সন্তোষ গুপ্তের সাফ জবাব, 'ভুল হয়নি। পুলিশ ঠিক লোককেই ধরে এনেছে।'

সরকারি চাকরি গেল। বেছে নিলেন সাংবাদিকতা। সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে অবাধ বিচরণ তো ছিলই। শিল্প ও চিত্রকলার প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। এদেশের প্রথম সারির প্রায় সব শিল্পীর শিল্পকর্মের উপর রয়েছে তাঁর বিদগ্ধ আলোচনাসমা লোচনা। মানুষের জীবনে শিল্প তো কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এর সঙ্গে জড়িত সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন। সন্তোষ গুপ্তের শিল্পভাবনা, চিত্রসমালোচনা, নাট্য সমালোচনাবিষয়ক লেখা এদেশের শিল্পীদের পথ দেখাবে।

শৈশব থেকে জীবনসংগ্রামী এক মানুষ কিভাবে আমৃত্যু সেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত সন্তোষ গুপ্ত নিজেই, যাঁর সামনে অজস্র সুযোগ ছিল অর্থ সম্পদের মালিক হবার, আরামআ য়েসে জীবন যাপন করার কিন্তু তাঁর প্রোলিতারিয়েত জীবনযাপন তাঁকে একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে পরিচিত করেছে। জীবনচেতনার কোন অংশ যদি ব্যক্তিমানুষের গণ্ডী ছাড়িয়ে স্পর্শ করতে পারে যুগ, কাল কিংবা সমকালীন সময়ের ঐতিহাসিক সত্যকে, ব্যক্তি হয়ে ওঠেন সমাজের প্রতিবিম্ব। সন্তোষ গুপ্ত সেই কালেরই প্রতিবিম্ব।

প্রিয়তোষ গুপ্ত সন্তোষ গুপ্তের পুত্র, ব্যাংকার

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications.

The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to fscom@hcidhaka.gov.in

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra August 2014

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উল্লেখ করতে হবে–
  ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত